চন্দ্র ও চম্পা

বামাচরণ মিত্র

অনুবাদক : জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার

করুণা প্রকাশনী / কলকাতা-৯

Digitized by srujan ka@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০৪

প্রকাশক :
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
ইন্দ্রনীল ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস :
রেজ ডট কম
৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর :
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮ বিধান সরণি
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মূল্য : ৪০ টাকা মাত্র

Digitized by srujan ka@gmail.com

চন্দ্র ও চম্পা

Digitized by srujan ka@gmail.com

উৎসর্গ

কটকে কাঠজুড়ি নদীতে
কতদিন আমরা একসঙ্গে সাঁতার কেটেছি—
তার গভীর দহে,
আবার বর্ষায় তার কূলপ্লাবী বন্যাস্ফীত বক্ষে,
বছরের পর বছর।
আমার সাঁতারের সঙ্গী সেই প্রয়াত বন্ধুর
বইয়ের অনুবাদ করতে গিয়ে
আজ আবার
যেন সেই আনন্দ সেই উল্লাস অনুবাদ করছি!

Digitized by srujan ka@gmail.com

অনুবাদকের নিবেদন

এই নিবেদনটি না পড়েই উপন্যাসখানি স্বচ্ছন্দে পড়া যায়। এমন কি মূল গ্রন্থে গ্রন্থকারের 'সূচনা' সম্বন্ধেও প্রায় তাই বলা চলে। তবে যাঁরা উপন্যাসের আখ্যানভাগটি তলিয়ে আস্বাদন করতে চান তাঁরা 'সূচনা'টি পড়তে পারেন। কারণ যে সময়ের কথা নিয়ে সেটি লেখা—অর্থাৎ বৌদ্ধ যুগের শেষ দিক—সেই সময়কার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে, বিশেষতঃ বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের (তখনকার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের) মধ্যেকার সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব ও পরিশেষে সাযুজ্য সম্বন্ধে লেখক 'সূচনা'য় কিছু আলোচনা করেছেন যাতে গল্পটি পাঠকের কাছে আরো স্পষ্ট ও উপভোগ্য হতে পারে।

লেখকের সেই আলোচনায় একটি জায়গায় পাঠকের কিঞ্চিৎ ধাঁধা লাগতে পারে এই ভেবেই কয়েকটি কথা নিবেদন করছি।

'সূচনা'র vii পৃষ্ঠায় এক জায়গায় আছে—"এতে (বৌদ্ধধর্মে) সাধারণ লোক মুক্তির স্বাদ পেল। দলে দলে মানুষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে লাগল।" এর পর একটি অনুচ্ছেদ বাদে তার পরের অনুচ্ছেদে আছে—"বুদ্ধের বৌদ্ধধর্ম কেবল সংসারত্যাগী বৌদ্ধভিক্ষুদের জন্য......"। তবে কি দলে দলে মানুষ সংসার ত্যাগ ক'রে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করল? না। এখানে লক্ষণীয় কথাটি হল 'বুদ্ধের বৌদ্ধধর্ম', যাকে ঐ বাক্যেরই অপর অংশে অশোকের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম থেকে আলাদা করা হয়েছে। অশোকের বৌদ্ধধর্ম গৃহীদের আকৃষ্ট করার উপযুক্ত ছিল, 'দলে দলে মানুষ' এই ধর্মকেই গ্রহণ করেছিল। সমস্ত পরিবর্তনই যে অশোক করেছিলেন তা বলা যাবে না। এমনিতেই বুদ্ধের উপদেশ অনুযায়ী কামনা-বাসনার বিনাশ গৃহীর পক্ষে সম্ভব ছিল কেবল খুব আংশিকভাবে। কাজেই বুদ্ধের অন্তে সৎ চিন্তা সৎ সঙ্গ ইত্যাদি 'অষ্টমার্গ' পালনে প্রথমে শিথিলতা ও পরে নিয়মের তথা ধর্মের পরিবর্তন এসেছিল—যা লেখক পরবর্তী দুইটি অনুচ্ছেদে প্রকাশ করেছেন। অশোক যখন তাঁর বৌদ্ধধর্ম প্রচার করলেন তখন বুদ্ধের দেহত্যাগের পর দুই শতাব্দী বা কিছু বেশী অতীত হয়ে গেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

আর একটি সামন্য কথা। উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদের ভিতরে কিছু স্ববিরোধ থেকে গিয়েছে—সম্ভবতঃ গ্রন্থকারের অনবধানতায়। তিনি তত্ত্ব নিয়ে অধিক নিয়োজিতচিত্ত ছিলেন। সেই স্ববিরোধ এড়াতে অনুবাদে ওই পরিচ্ছেদের যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রয়াত গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ আমায় বলেছেন যে গ্রন্থকার ওড়িশার নয়াগড়ে মহকুমা-শাসক থাকা কালে ১৯৫৮ সালে সেখানকার 'বিকাশ প্রতিষ্ঠান' নামক প্রকাশন সংস্থা কর্তৃক উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। দশ বৎসর পরে ১৯৬৮ সালে কটকস্থ 'কটক স্টুডেন্টস্ স্টোর' বইখানির 'সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ' বার করেন। আরও দশ বৎসর পরে ১৯৭৮

Digitized by srujan ka@gmail.com

সালে তাঁরা তার 'দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আগেরটিই দ্বিতীয় সংস্করণ এবং পরেরটি তারই পুনর্মুদ্রণ, আগেরটির সঙ্গে এর কোনও তফাত নেই। গ্রন্থকার তো তার তিন বৎসর আগেই ১৯৭৫ সালে ঊনষাট বৎসর বয়সে ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন! এই অনুবাদে আমি তাই ১৯৬৮ সালের তথাকথিত 'সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ'টিই অবলম্বন করেছি। সুদীর্ঘকাল পরে অনুবাদের দরুন কিছু কিছু পাদটীকা দিতে বাধ্য হয়েছি।

পরিশেষে গ্রন্থকার পরিচিতি। স্বয়ং বামাচরণ মিত্র (১৯১৫-'৭৫)-এর কাছেই শুনেছি তাঁর পূর্বপুরুষ খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম সহচর হয়ে সপরিবারে ওড়িশায় এসে এই দেশেই বসবাস করে থেকে যান। তাঁদের সন্তান-সন্ততি অন্যান্য ওড়িশাবাসী বাঙ্গালীর মত কালক্রমে অনেকাংশে ওড়িয়া রীতিনীতি ও সেই সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত ওড়িয়া ভাষা গ্রহণ করেন। বামাচরণের পিতা কৃষ্ণপ্রসাদ তাঁর কটকস্থ নিজ গৃহে থেকে কটক কলেক্টরেটে কর্মরত ছিলেন। তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে বামাচরণ মধ্যম। তিনি B.A., B.L. পাস করার পরে ওড়িশা সরকারের অধীনে উচ্চ পদে আসীন হন। কর্মকালের মধ্যেই তিনি মধ্য বয়স থেকে ওড়িশা ভাষায় প্রথমে শার্লক হোমস্ জাতীয় ডিটেকটিভ গল্প এবং তারপর আমৃত্যু অন্যান্য বহু ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ ও রম্যরচনা লিখে প্রভূত সাহিত্যখ্যাতি লাভ করেন। 'চন্দ্র ও চম্পা' তাঁর এক মাত্র উপন্যাস। মৃত্যুকালে তাঁর ষাট বৎসরও পূর্ণ হয় নি। ওড়িশা সাহিত্য একাদেমি তাঁকে মরণোত্তর সাহিত্য সম্মানে ভূষিত করেন।

সাহিত্যযশঃপ্রার্থী হয়ে বামাচরণ লেখায় হাত দেননি। মানুষের সুখদুঃখ নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনা তাঁকে লেখায় প্রবৃত্ত করেছিল। তাই তাঁর লেখায়, বিশেষতঃ তাঁর ছোটগল্পে ও এই একমাত্র উপন্যাসে, তাঁকে দেখা যায় একজন প্রকৃত মানব-দরদীরূপে। সাধারণ মানুষ, দুর্বল মানুষ—দুর্বল, ক্ষমতা ও চরিত্র উভয়তঃ, যে বারবার তার আন্তরিক সততা, মানব-প্রেম, ও অসীমের প্রতি আকুতি থেকে স্খলিত হয় ও বারবার সেই আদর্শেরিই স্বপ্ন দেখে—বিশেষ করে তার জন্যই যেন তাঁর কলমে সংবেদনা ক্ষরিত হয়। তারই জন্য যেন বার বার তাঁর অন্তর আপ্লুত ক'রে তাঁর কানে এসে পৌঁছায় ওড়িশার দূরান্তরস্থিত তাঁর পূর্বপুরুষদের স্থাপিত রাধাকৃষ্ণ মন্দির থেকে অনন্তের আকুতি ব'য়ে ভেসে আসা চিরসুন্দরের আকুল বংশীধ্বনি।

—জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার

■ এই বইয়ের সমস্ত পাদটীকা অনুবাদকের।

Digitized by srujan ka@gmail.com

মূল গ্রন্থে

গ্রন্থকার প্রদত্ত

সূচনা

কথা কও, হে অনাদি অতীত। চিরদিন তুমি নববধূর ন্যায় নীরব। ঐতিহাসিক প্রত্নবিদ্ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তোমায় কথা কহাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তুমি শুধু মৌনে চাহিয়া আছ। সাহিত্যিক লেখকগণ তোমায় কথা বলাইতে চাহিয়াছেন, তুমি শুধু স্মিত হাসি হাসিয়াছ। আমি সামান্য লেখক আমার ক্ষীণ কল্পনায় তোমার মুখের বাণী শুনিতে চাহিতেছি, জানিনা আমার এই অপটু প্রয়াস তোমার অধরে কি ভাব ফুটাইবে!

* * * * * * * * *

এই কাহিনীটি কাল্পনিক হলেও এর ভিত্তি ইতিহাসের উপরে স্থাপিত। তবে সে ইতিহাস অন্ধকারের গর্ভে লীন। যে দুই তিনটি আলোকরেখা অন্ধকার ভেদ করে তার উপর পড়েছে তাই শুধু এ কাহিনীর সম্বল।

এই ইতিহাস খ্রিঃপূঃ প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। মৌর্য বংশের ইতিহাসবিশ্রুত সম্রাট দেবানাং প্রিয় প্রিয়দর্শী শ্রীমন্মহারাজ দেবপাদ অশোকের শেষ বংশধর মগধরাজ বৃহদ্রথকে হত্যা ক'রে তাঁর ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র সুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস যে বৌদ্ধধর্মের বিলোপ করে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুণঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের চক্রান্তেই বৃহদ্রথ নিহত হন।

একজন ঐতিহাসিক* বলেন, বৌদ্ধধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণদের ক্রোধের অনেক কারণ ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রচলন হেতু ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি নষ্ট হয়েছিল। সম্রাট অশোক যজ্ঞে পশুবলি নিষেধ করায় ব্রাহ্মণদের অপ্রীতিভাজন হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণগণ যে এ যাবৎ 'ভূদেব' বলে পূজিত হতেন, অশোকের অনুশাসনের ফলে তাঁরা এখন

---

*এই ঐতিহাসিক সম্ভবতঃ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (Provatansumaiti প্রণীত *Studies in Ancient India*, 11th edition, 1998,পৃষ্ঠা 279 দ্রষ্টব্য)।

Digitized by srujan ka@gmail.com

দেবতার আসন হারালেন*। অশোক যে সকল 'ধম্ম মহামাত্ত' (ধর্ম মহামাত্র) নিযুক্ত করলেন তাতে ব্রাহ্মণদের বিশেষ সম্মানহানি ঘটল। কারণ 'ধম্মমহামাত্ত' রা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ধর্ম সম্বন্ধে সরল শিক্ষা দেওয়াতে ব্রহ্মণদের প্রতি সাধারণ লোকের ভয়ভক্তি ক্রমে লোপ পেতে লাগল। তা ছাড়া 'ধম্মমহামাত্ত'দের 'দণ্ডসমতা'র নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যার অর্থ এই যে অপরাধ করলে ব্রাহ্মণেরাও সাধারণ লোকের সঙ্গে সমানভাবে দণ্ড ভোগ করবেন। এই প্রকার নানা কারণে ব্রাহ্মণেরা সম্মান প্রতিপত্তি ও জীবিকা হারিয়ে মৌর্যবংশ ও বৌদ্ধধর্মের বিষম শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। এই সবের শেষ ফল বৃহদ্রথকে হত্যা করে পুষ্যমিত্র সুঙ্গের সিংহাসন আরোহণ।

উৎকল বা উৎকলিঙ্গ বা ওড়িশার এই সময়কার ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। অনিশ্চিত ভাবে বলা যায় তখন সম্ভবতঃ সেখানে রাজত্ব করছেন চেদি বা চেতি বংশের রাজা বীর মহারাজ মহামেঘবাহন শ্রীখারবেল ঐর**। মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত এক সময়ে কলিঙ্গ (বা উৎকল) জয় করেছিলেন বটে, কিন্তু পরে অশোকের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে কলিঙ্গ স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

খ্রিঃ পূঃ ২৬১-তে অশোক তাঁর রাজত্বের অষ্টম বর্ষে আবার কলিঙ্গ আক্রমণ ক'রে যে বিপুল হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিলেন তা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই জানা। লিখিত আছে যে অশোক বহু লক্ষ কলিঙ্গ সেনা হত্যা ও আরও বহু লক্ষ বন্দী করেছিলেন। কিন্তু এই ছিল অশোকের শেষ যুদ্ধ। এই উৎকলেই 'চণ্ডাশোক' 'ধর্মাশোকে' পরিণত হয়েছিলেন। এর পরে কোনও সময়ে কলিঙ্গ আবার স্বাধীন হয়।

খ্রিঃ পূঃ ১৮৭ অথবা ১৮৫-তে পুষ্যমিত্র যখন বৃহদ্রথকে হত্যা করে সুঙ্গবংশ প্রতিষ্ঠা করেন তখন খারবেল পূর্ণ প্রতাপে উৎকল রাজ্য শাসন করছেন এমন একটা ঐতিহাসিক মত আছে। অন্য ঐতিহাসিকেরা তাঁদের দুই জনকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ের লোক ব'লে মনে করেন। তবে ওই মত অনুসারে খারবেল পুষ্যমিত্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে কলিঙ্গের সীমা উত্তরে গঙ্গা থেকে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত এবং পশ্চিমে পঞ্জাব থেকে পূর্বে বঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। বস্তুতঃ খারবেল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য যা জানা যায় তা অতি সামান্য এবং তাও কেবল একটি উপাদান থেকে, তা হল ভুবনেশ্বরের কাছে, প্রায় ১০ কিলোমিটার পশ্চিমে, খণ্ডগিরি-উদয়গিরি পাহাড়ের উদয়গিরিতে হাতীগুম্ফা নামক গুহায় উৎকীর্ণ শিলালিপি। এই

* পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা 256 ও 279

** ইরা অর্থাৎ পৃথিবীর পুত্র। তখন সম্ভবতঃ খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে।

Digitized by srujan ka@gmail.com

শিলালিপিও কতক কতক ক্ষয়প্রাপ্ত, এর থেকে খারবেলের কাল নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। সেই লিপি এই রকম:—

> 'নমো অর্হতানাং নমো সববিধানং বেরেণ মহারাজেন মহামেঘবাহনেন চেতরাজ বসবধনেন পসথ সুভলখনেন চতুরং তালং নগুনোপগতেন কলিংগাধিপতিনা সিরি খারবেলেন.......' ইত্যাদি।

উৎকলের তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস তিমিরাবৃত হওয়ার কারণ প্রধানতঃ সমগ্র ভারতবর্ষের কখনও একতা ছিল না। এই সুবিস্তীর্ণ বিশাল ভূভাগে কোথায় কখন কোন রাজ্যের উত্থান বা কোন রাজ্যের পতন হচ্ছে তার হিসাব রাখা সমুদ্রের ঢেউ গোনার মতই দুঃসাধ্য ছিল। উপরন্তু বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে প্রায়শঃই বিবাদের ফলে তা আরও জটিল হয়েছিল।

ইউরোপীয় জীবনযাত্রা সেখানকার রাজনীতি থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেনি। কিন্তু ভারতবর্ষে লোক সাধারণের জীবনযাত্রা তার রাজনীতির মধ্যে প্রকাশ না পেয়ে প্রকাশ পেয়েছে তার ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে। ভারতবর্ষে তাই আজ পর্যন্ত রাজনীতিকে ধর্ম ও দর্শন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রাখা সম্ভব হয় নি।

ভারতবর্ষে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থের সংখ্যা অজস্র। কিন্তু কোনো গ্রন্থে সঠিক কাল ও ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় না। সে সময়ে ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারায় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না। পুনশ্চ, যাঁদের বা ইতিহাস-লেখক বলা যাবে তাঁরা মূলতঃ ছিলেন কবি। বাস্তব ঘটনার সঙ্গে কবিকল্পনা এমন কারুকৌশলে তাঁরা মিশিয়ে লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে ঐতিহাসিকের পক্ষে তার ভিতর থেকে প্রকৃত ইতিহাস ছেঁকে তোলা অসম্ভব। সত্যকে তাঁরা বাস্তবের মধ্যে না খুঁজে খুঁজেছিলেন কল্পনার মধ্যে। তাঁদের কাছে কল্পনা ছিল অধিক বাস্তব।

আর্যদের প্রথম সৃষ্টি চারটি বেদ। প্রত্যেক বেদের চারটি অঙ্গ, যথা—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, ও উপনিষদ্ বা বেদান্ত। বেদের সৃষ্টির কাল সম্বন্ধে নানা মত থাকলেও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এর কাল স্থূলতঃ খ্রিঃ পূঃ ২০০০। বেদ কোনও একজনের সৃষ্টি নয় এবং একই সময়ে সৃষ্টও হয়নি। সংহিতা থেকে আরম্ভ করে বেদান্ত পর্যন্ত বেদের সমুদয় চারটি অঙ্গ খ্রিঃ পূঃ ২০০০ থেকে ৩০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে নানা ঋষি ও মনীষী কর্তৃক রচিত।

বেদ চারটি, যথা—ঋগ্বেদ (ঋক্ বেদ), সামবেদ, যজুর্বেদ (যজুঃ বেদ) ও অথর্ববেদ। অনেকে আয়ুর্বেদকে পঞ্চম বেদ ব'লে থাকেন। আবার অনেকে বলেন এটি অথর্ববেদের উপাঙ্গ। তবে প্রত্যেক বেদের পূর্বোক্ত চারটি অঙ্গ —সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্—আয়ুর্বেদে না থাকায় অনেকে একে বেদ ব'লে স্বীকার

Digitized by srujan ka@gmail.com

করেন না।

ঋগ্বেদের সংহিতাভাগ আর্যদের এক অপূর্ব সৃষ্টি। আর্যদের দুইটি দল দুই বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে *। সে সময়ে ভারতবর্ষে যে সভ্যতা ছিল তা দ্রাবিড় সভ্যতা। এই সভ্যতাও খুব উন্নত ছিল। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় (অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্গত) তার আভাস পাওয়া যায়।

প্রথম দলটি কাবুল উপত্যকা দিয়ে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। এই আর্যেরা সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীপুত্রপরিবার ও গৃহপালিত পশুও এনেছিলেন এবং ক্রমে তাঁরা পঞ্জাবের সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে বসবাস করতে লাগলেন। এই স্থানই পরবর্তী কালে আর্যাবর্ত নামে অভিহিত হয়েছে। এঁরা এই উর্বর ভূমি কর্ষণ করে প্রচুর শস্য উৎপাদন করতে লাগলেন এবং মনের আনন্দ প্রকৃতির নানা রূপের বর্ণনা করতে লাগলেন। এই বর্ণনা থেকেই ঋগ্বেদ সংহিতার সৃষ্টি।

দ্রাবিড়দের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত হয়েও এই আর্যদের মনের আনন্দ হ্রাস পায়নি। তাঁরা প্রকৃতির বিচিত্র রূপের জয়গান করে চললেন। কখনো অগ্নিরূপে কখনো বা মেঘ রূপে, কখনো বরুণ রূপে কখনো বা রুদ্র রূপে তার বন্দনা করলেন। যখন যে রূপের বর্ণনা করেছেন তখন সেই রূপকেই সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলে উল্লেখ করেছেন।

বেদে তাই দেখতে পাওয়া যায় শিশুসুলভ বিস্ময়, আবেগ ও আনন্দের সঙ্গে জিজ্ঞাসা এবং উন্মুখ অন্তরের যা কিছু কামনার সরল, অকপট, উন্মুক্ত প্রকাশ ঃ—

"উরুং হি বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থামন্বেতবা উ।
অপদে পাদা প্রতিধাতবতেহকরুতাপ বক্তা হৃদয়াবিধশ্চিৎ॥ দধিশ্চিত্র"

—রাজা বরুণ সূর্যের ক্রমাগত গমনার্থে পথ বিস্তীর্ণ করেছেন। তিনি আমার হৃদয়বিদ্ধকারী শত্রুকে তিরস্কার করুন।

* অপরপক্ষে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি অভিমত গড়ে উঠেছে যে আর্যেরা বহিরাগত নন, ভারতবর্ষই তাঁদের আদি আবাসভূমি। তবে ভারবর্ষের কোন অঞ্চলে তাঁদের সেই আদি নিবস ছিল তা নিয়ে তাঁদের বিভিন্ন মত রয়েছে, যথা—(১) গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম স্থলে ব্রহ্মর্ষি দেশ; (২) কাশ্মীর ও হিমালয়ের পাদদেশ; (৩) পশ্চিম পঞ্জাবের (অধুনা পাকিস্তানে) মুলতান; এবং আফগানিস্থান।— Probhatansu Maiti, *Studies in Ancient India,* 11th edition, 1998, পৃষ্ঠা 37-38।

[পঞ্জাব-ই সাধু বানান চলন্তিকা দ্রষ্টব্য]

Digitized by srujan ka@gmail.com

"শগ্ধি পূর্ধি প্রয়ংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরং।
পুষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ"

—(হে পুষাদেবতা) আমাদিগকে অনুগ্রহ করতে সক্ষম হও, আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ কর, অভীষ্ট বস্তু দান কর, আমাদিগকে তীক্ষ্ণতেজা কর, আমাদের উদর পূর্ণ কর।

"মা রায়ো রাজন্ ৎসুয়মাদব স্বাং বৃহদ্‌বদেম বিতথে সুবীরাঃ"

—হে বরুণ, আমাকে যেন কোনও ধনী ও প্রভূত দানশীল ব্যক্তির নিকটে জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলতে না হয়। হে রাজা, আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না থাকে। অমি পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হয়ে এই যজ্ঞে তোমার বহু স্তুতি করব।

দর্শন বলতে আমরা এখন যা বুঝি সেরকম দর্শন সংহিতায় নেই। আর্যেরা দ্রাবিড়দের নিকট থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ থেকে জীবন যাপন করতেন, তাদের সঙ্গে কোনও রকম সংস্রব তাঁরা ঘৃণা করতেন। তখন আর্যদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না এবং নারীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন।

পরে যে আর এক দল আর্য এলেন তাঁবা হিন্দুকুশ পর্বত লঙ্ঘন করে কাশ্মীরে গিলগিট্ ও চিত্রলের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁরা ক্রমে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূমিতে বাস করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে অল্প কয়জনই সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীপুত্র পরিবার এসেছিলেন, কাজেই তাঁরা দ্রাবিড়দের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য হলেন।

ক্রমে ক্রমে আর্য রক্ত ও সভ্যতার সঙ্গে দ্রাবিড় রক্ত ও সভ্যতা মিশ্রিত হওয়ায় আর্য সভ্যতার ক্রমপরিবর্তন হতে লাগল। দ্রাবিড় সভ্যতায় তখন নানা ক্রিয়াকাণ্ড, সর্পপূজা, দেবীপূজা, লিঙ্গপুজা, বলিদান প্রভৃতি ছিল। বিশেষতঃ তাঁদের সমস্ত কর্ম ইন্দ্রজাল বা কুহকবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। আর্যেরা এই সবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসার ফলে বৈদিক ধর্ম ও চিন্তাধারায় মৌলিক পরিবর্তন ঘটল।

এই সময়ে বেদের দ্বিতীয় অঙ্গ ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। ব্রাহ্মণ শব্দের আদি অর্থ মন্ত্র, যা যথাযথ পাঠ করে তন্নির্দিষ্ট ক্রিয়াকাণ্ড অক্ষরে অক্ষরে পালন করলে অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, শব্দ উচ্চারণ বা ক্রিয়াকাণ্ডে সামান্য দোষ ঘটলে অভীষ্ট তো সিদ্ধ হবেই না, উপরন্তু কুফল ফলবে এইরূপ বিশ্বাস। মন্ত্রপাঠের উদাহারণ ঃ ঋগ্বেদ সংহিতার 'ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেব মৃত্বিজং হোতারং রত্নধ তমং' এই সূক্তটি স্বরিত, উদাত্ত ও অনুদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণসহকারে ঘনপাঠ ক্রমপাঠ আদি পদ্ধতিতে পাঠ করতে হবে,—যথা অগ্নি গ্নিমী মীলে আদি; আবার, অগ্নিমী গ্নিমীলে লেপুরো ইত্যাদি।

সংহিতা যুগ যদি খ্রিঃ পূঃ ২০০০ থেকে খ্রিঃ পূঃ ১৫০০ বলে ধরা যায় তাহলে

Digitized by srujan ka@gmail.com

ব্রাহ্মণ যুগ খ্রিঃ পূঃ ১০০০ হতে পারে। এই যুগে সংহিতার কয়েকটি দেবতার তিরোভাব ঘ'টে কয়েকটি নূতন দেবতার আবির্ভাব দেখা যায়। বিশেষতঃ দেবীগণের আবির্ভাব এই যুগে। ব্রাহ্মণ গদ্যের আকারে লিখিত, এবং কেবল ক্রিয়াপদ্ধতি ও অনুষ্ঠানের বর্ণনায় পূর্ণ। উল্লেখ্য, এই ক্রিয়া যথাযথভাবে পালন করতে হবে। জ্যামিতি জ্যোতিষ ছন্দ(স্) প্রভৃতি শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে।

যজ্ঞে পশুবলি এই সময়েই প্রচলিত হ'ল। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন নানা ক্রিয়াকর্ম, অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞে এমনভাবে বেঁধে দেওয়া হ'ল যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত বিনা লোকের এক পাও চলবার উপায় রইল না। অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় এবং কুফলের ভয়ে লোকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সম্পূর্ণ করায়ত্ত হয়ে পড়ল, তাদের স্বাধীন চিন্তা রইল না। জাতিভেদের সৃষ্টিও এই সময়ে। তবে ব্রাত্যষ্টোম নামক যজ্ঞের দ্বারা নিম্নশ্রেণী থেকে উচ্চশ্রেণীতে ওঠা যেত। শূদ্রদের অবস্থা এই সময়ে অতীব শোচনীয় ছিল এবং স্ত্রীস্বাধীনতা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছিল।

ব্রাহ্মণের পরে আরণ্যকের সৃষ্টি। যতদূর মনে হয় আরণ্যকের সৃষ্টি বৃদ্ধ ও অকর্মণ্যদের জন্য। যারা নানা প্রকার ক্রিয়াকর্ম পালন করতে অক্ষম তারা কোনো যজ্ঞের প্রতীকস্বরূপ অন্য বিশেষ কিছু ধ্যান করলেই সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলের অধিকারী হত। উদাহরণ স্বরূপ—অশ্বমেধের মত বিরাট যজ্ঞ না ক'রে ঊষাকে যজ্ঞের অশ্বের মস্তক, সূর্যকে অশ্বের চক্ষু, বায়ুকে অশ্বের জীবন ইত্যাদি রূপে কল্পনা করে ধ্যান করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হবে। আরণ্যক সৃষ্টির দ্বারা স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পাওয়া গেল। ক্রিয়াকর্মাদি থেকে মুক্ত হয়ে লোকে কল্পনা ও চিন্তা করতে সক্ষম হ'ল। এই সময়ে উপনিষদের ভিত্তি স্থাপন হ'ল।

উপনিষদ্‌গুলি ভারতীয় চিন্তাধারায় তথা দর্শনে বিপ্লব সৃষ্টি করল। উপনিষদ্‌গুলি যুক্তিবদ্ধ ধারাবাহিক চিন্তা নয়, তবে বিরাট কল্পনা। বিশুদ্ধ চিন্তা দ্বারাই সৃষ্টিতত্ত্ব বোঝার চেষ্টা উপনিষদে পাওয়া যায়।

উপনিষ্‌দের দার্শনিক কল্পনার পরে আমরা ভারতবর্ষীয় দর্শনে যুক্তিবদ্ধ ধারাবাহিক চিন্তা দেখতে পাই। এই চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে ভারতের ষড়্‌দর্শনে। সেই ছয়টি হ'ল—ন্যায়, বৈশেষিক, উত্তরমীমাংসা, পূর্বমীমাংসা, সাংখ্য, ও যোগ। এর পর ভারতীয় চিন্তাধারায় পুনরায় একবার পতন ঘটল যখন পণ্ডিতগণ মৌলিক চিন্তা ছেড়ে দিয়ে বেদ ও উপনিষদের নানা সূক্ষ্ম অর্থ* বার করায় ব্যাপৃত হলেন। এটি টীকা বা ভাষ্যের যুগ।

* ওই বাক্যে 'ভারতীয় চিন্তাধারায় পুনরায় পতন' প্রসঙ্গে 'সূক্ষ্ম অর্থ' কথাটি গ্রন্থকার নিশ্চয় প্রশংসাচ্ছলে ব্যবহার করেন নি, বরং হয়তো এর দ্বারা প্রতীকী অর্থ অথবা বিকৃত অর্থ, কিংবা উভয়ই বলতে চেয়েছেন।

Digitized by srujan ka@gmail.com

বুদ্ধদেবের জন্মের সময়ে (খ্রিঃ পূঃ ৫৬৪) ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার প্রতিপত্তির চরমে উঠেছিল। জাতিভেদ প্রথা তখন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। ক্রিয়াকর্ম যাগ-যজ্ঞ পূজা-পদ্ধতি ইত্যাদির পাকে সাধারণ মানুষ এমনভাবে জড়িত যে তাদের স্বাধীনতা নেই বললেই হয়। জাতিভেদ কর্মকাণ্ড প্রভৃতির আচার আচরণে কোথায় কি ভুলচুক হয় এই ভেবে দেবতার ও ভগবানের রোষের ভয়ে মানুষ অস্থির। এমনি সময়ে এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ এক মহা বিপ্লবের সৃষ্টি করলেন।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থাও তখন ঘোর নৈরাশ্যজনক। নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও পরস্পর বিবদমান রাজ্যে তখন ভারতবর্ষ শতধা বিভক্ত। চিন্তারাজ্যে তখন উপনিষদ ও সাংখ্য দর্শনের সবে গোড়া পত্তন হয়েছে। এই নিরাশার অন্ধকারে বুদ্ধ আলোক এনে দিলেন তাঁর অতি সরল ধর্ম মানুষকে অতি সরল ভাষায় বুঝিয়ে। তাঁর বক্তব্য কেবল চারটি সহজ সত্য ঃ— জীবন দুঃখময়; দুঃখের কারণ আমাদের কামনা-বাসনা; অতএব কামনার বিনাশে দুঃখের বিনাশ; কামনার বিনাশের উপায় বা মার্গ আটটি ('অষ্টমার্গ') —সৎচিন্তা, সৎসঙ্গ ইত্যাদি। এর জন্য নানা যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম পূজা-পদ্ধতির দরকার নেই, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, নানা দেবদেবী চিন্তার আবশ্যক নেই। এতে সাধারণ লোক মুক্তির স্বাদ পেল। দলে দলে মানুষ বৌদ্ধ-ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল।*

বৌদ্ধধর্মে সাধারণ মানুষকে নিয়ে চলবার এই আদর্শ, সহজ সরল পন্থা, ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব থেকে মুক্তি এবং সাম্য সবাইকে আকৃষ্ট করল। বুদ্ধ ও মহাবীর (জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা) উভয়েই ছিলেন ক্ষত্রিয়। প্রাধান্য নিয়ে সে সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে এক প্রকার দ্বন্দ্ব চলছিল। সাধারণ মানুষ চিরকাল স্বাধীনতা চায়, তার জন্য সংগ্রাম করে। কিন্তু স্বাধীনতা পেলে তখন তার লক্ষ্য কি হবে তা ভেবে রাখেনা। তাই অনেক সময়ে দেখা যায় এক শক্তির কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে মানুষ আর এক শক্তির কবলে পড়ে। লোকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে আর এক ধর্মের কবলে পড়ল। বৌদ্ধ ধর্মেও ধর্মের নাম করে এক সময়ে কম অনিয়ম অনাচার হয়নি। সে কথায় পরে আসছি।

তথাগত বুদ্ধ আশি বৎসর বয়সে নির্বাণ লাভ করেন। এর দুই শ বৎসর পরে এলেন সম্রাট অশোক। চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের জন্য তিনি তাঁর সমস্ত রাজশক্তি প্রয়োগ করলেন। বৌদ্ধধর্ম সিংহল চীন প্রভৃতি দেশে আদৃত হ'ল। অশোকের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম কিন্তু আদি বৌদ্ধধর্ম থেকে অনেকাংশে ভিন্ন। বুদ্ধের বৌদ্ধধর্ম কেবল সংসারত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য, কিন্তু

* দলে দলে মানুষের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে বোধ হয় বুদ্ধের অনেক পরে, সম্রাট অশোকের সময়ে। পরবর্তী অনুচ্ছেদের পরের অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

Digitized by srujan ka@gmail.com

অশোকের বৌদ্ধধর্ম মুখ্যতঃ গৃহীদের জন্য। তাই গৃহী মানুষকে আকৃষ্ট করতে অশোক তাঁর বৌদ্ধধর্মে স্বর্গ নরক দেবপূজা আদির কল্পনা প্রবেশ করিয়েছিলেন।

বুদ্ধের নির্বাণলাভের এক শ বৎসর পরে বৈশালীতে (বর্তমান বিহারে, মজঃফরপুর জেলায়) বৌদ্ধভিক্ষুদের এক বিরাট সভা হয়। এ ছিল ভিক্ষুদের দ্বিতীয় সভা। এই সভায় এক প্রবল মতভেদ প্রকাশ পায়। বজ্জী বংশীয় যুবক ভিক্ষুগণ দশবস্তু নামক কতকগুলি নিয়মে পরিবর্তন আনতে চাইলেন যাতে ভিক্ষুর দৈনন্দিন জীবন যাপনে কয়েকটি নিয়মের কঠোরতা কিছু পরিমাণে হ্রাস পায়,—'কপ্‌পতি জলোগী কপ্‌পো' অর্থাৎ ভিক্ষুদের মদ্যপান নিষেধ। যুবকেরা বললেন, যে রস সন্ধিত হয়নি (গেঁজে ওঠেনি) তা পান করাতে নিষেধ থাকা উচিত নয়। 'কপ্‌পতি জাত রূপ রজতন্তি'— ভিক্ষুদের সোনা-রূপা স্পর্শ করা নিষেধ। যুবভিক্ষুরা বললেন, স্পর্শ এড়িয়ে কেউ যদি পাত্রে সোনা-রূপা দেয় তাতে আপত্তি করার কারণ নেই। স্থবিরগণ এ সবের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। এ থেকেই আরম্ভ হ'ল হীনযান ও মহাযান বা মহাসাংঘিক। যুবকেরা সংখ্যায় অধিক থাকায় তাঁরা নিজেদের মহাসাংঘিক বলে প্রচার করলেন। স্থবিরগণ, যাঁরা নিয়মাদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার পক্ষে ছিলেন, তাঁরা হলেন হীনযান। মহাযান বৌদ্ধধর্ম ক্রমে উত্তরে ও হীনযান ক্রমে দক্ষিণে প্রসার লাভ করল।

এর পরে, বুদ্ধের জন্মের প্রায় পাঁচশ বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্মে আরো শৈথিল্য ও নানা অনাচার, ব্যাভিচার প্রবেশ করতে লাগল। শেষে তন্ত্রযান সহজযান বজ্রযান ইত্যাদি নামে নিরঙ্কুশ কামলীলার শুরু হ'ল। অনেক মন্দিরগাত্রে যে সব অশ্লীল মূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায় তা এই সময়ের সৃষ্টি।

বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র সিংহাসনে বসার পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রবল প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম গণধর্ম হয়ে থাকায় ব্রাহ্মণেরা তার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ত্যাগ করে পরোক্ষভাবে তার বিলোপসাধনের চেষ্টা দেখলেন। বিষ্ণুর নানা অবতারের মধ্যে বুদ্ধদেবকেও এক অবতার (বলরামের পরে, নবম অবতার) রূপে গ্রহণ ক'রে তাঁকে এবং তাঁর দর্শনকে তাঁরা আপন ধর্মের শামিল করে নিলেন। সাধারণ লোক চিরদিনই সুবিধাবাদী। ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে দিয়ে কিছু ক্রিয়াকাণ্ড করিয়ে যদি নিজের সাংসারিক সুখ ও উন্নতি লাভ হ'তে পারে তবে তার প্রতি কে না আকৃষ্ট হবে!

ব্রাহ্মণেরা প্রথম থেকেই যেমন জ্ঞানী তেমনি বুদ্ধিমান্ ও দূরদর্শী। জনসাধারণের সামান্য আশা আকাঙ্ক্ষার সুবিধা নিয়ে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের অধিকাংশ মতবাদ, দর্শন ও তার তৎকালীন ক্রিয়াকাণ্ডে সামান্য সামান্য পরিবর্তন ক'রে নিজেদের ধর্মে চালিয়ে দিলেন। জৈনধর্মকেও তাঁরা সেই উপায়েই নিজেদের ধর্মের অঙ্গীভূত করে নিলেন। এইভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নিজেও অনেকটা নূতন আকার নিল।

Digitized by srujan ka@gmail.com

এই ধর্মই হিন্দুধর্ম নামে খ্যাত। এই ধর্মে বিভিন্ন ধর্মের দর্শন ও ক্রিয়ানুষ্ঠান রইল এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মণের প্রভুত্বও বজায় রইল। তাই পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মকে যদি মনুষ্যসৃষ্ট সুবিন্যস্ত উদ্যানের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে হিন্দুধর্মকে বলতে হয় প্রকৃতির স্বচ্ছন্দজাত বিশাল অরণ্য! এই ধর্মে চোর সাধু, আস্তিক নাস্তিক, প্রতিমাপূজক নিরাকারবাদী সকলের জন্যই স্থান আছে*। পরে হিন্দুধর্ম এতই ব্যাপক হ'ল যে তাতে পৃথিবীর সব ধর্মের লোককেই এক হিসাবে হিন্দু বলা যায়। অর্থাৎ যে যে-পথেই চলুক সে যদি সত্যের অনুসন্ধান করতে থাকে তবে সে হিন্দু। হিন্দুধর্মের কোনো নির্দিষ্ট মার্গ কিংবা দর্শন নেই**। ভারতবর্ষকে ব্রাহ্মণদের এই শ্রেষ্ঠ দান।

ভারতবর্ষে নানা মতবাদ নানা ধর্ম নানা বৈশিষ্ট্য নানা জাতি থাকলেও এই হিন্দুধর্ম

* ডি. এল. রায়-এর (দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩-১৯১৩) 'এমন ধর্ম নাই' গানের এক কলি মনে পড়ে—

"যদি চোরই হও কি ডাকাত হও, তা গঙ্গায় দাও গে ডুব,
আর গয়া কাশী পুরী যাও, সে পুণ্যি হবে খুব।
আর মদ্য মাংস খাও বা—যদি হয়ে পড় শৈব,
আর না খাও যদি বৈষ্ণব হও—এর গুণ কত কইব!
(কোরাস্) ছেড়োনাক এমন ধর্ম, ছেড়োনাক ভাই
এমন ধর্ম নাই আর দাদা, এমন ধর্ম নাই!
(বাদ) তড়ালাক্ তড়ালাক্ তড়ালাক্ ডুম্।"

** এই প্রসঙ্গে প্রয়াত মনীষী রাজশেখর বসুর (১৮৮০-১৯৬০) অসাধারণ চিন্তাপ্রসূত উক্তি উল্লেখযোগ্য ঃ—

"......... রোমান ও হিন্দু নাগরিক দুইই পেগান (pagan) ও ক্রীড (creed)—শূন্য। সাধারণত দেখা যায়, পৌরুষেয় অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্তিত ধর্মই ক্রীডের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ জৈন খ্রীষ্টান মুসলমান ও শিখ ধর্মে ক্রীড আছে। কিন্তু অপৌরুষেয় ধর্ম, যেমন গ্রীক ও রোমানদের পেগান ধর্ম এবং সনাতন হিন্দুধর্ম ক্রীডবর্জিত। যারা তেত্রিশ বা তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা করে এবং সেই সঙ্গে এক পরমাত্মাকে মানতেও যাদের বাধেনা, তারা সহজেই মাঝে মাঝে পুরাতন দেবতা বর্জন এবং নূতন দেবতা গ্রহণ করতে পারে। অন্য ধর্মের প্রতি তাদের আক্রোশও থাকে না। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ প্রভৃতি এখন আর পূজা পান না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ দেবতার আসন পেয়েছেন, ভারতমাতা ও বঙ্গমাতাও দেবতারূপে গণ্য হয়েছেন। রূপকের আশ্রয়ে জন্মভূমিকে দুর্গা কমলা ও বাণীর সঙ্গে একীভূত কল্পনা করা হিন্দুর পক্ষে সহজ, কিন্তু একেশ্বরপূজকের তা ক্রীডবিরুদ্ধ। এই কারণেই 'বন্দে মাতরম্' অন্যতম জাতীয় সঙ্গীতরূপে গণ্য হয় নি, লোক ভোলাবার জন্য তাকে 'সমান মর্যাদা' দেওয়া হয়েছে। বহু আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু বকরিদের খাসির মাংস অথবা খ্রিষ্টান ইউকারিস্ট্ সংস্কারে নিবেদিত রুটির টুকরো পেলে বিনা দ্বিধায় খেতে পারেন, কারণ তাঁদের দৃষ্টিতে এ সকল বস্তু খাদ্য মাত্র। কিন্তু খ্রিষ্টান মুসলমান এবং গোঁড়া ব্রাহ্মর পক্ষে হিন্দু দেবতার প্রসাদ খাওয়া সহজ নয়, তাঁরা মনে করেন এ প্রকার খাদ্যে পৌত্তলিক বিষ আছে, খেলে আত্মা ব্যাধিগ্রস্ত হবে।" ('বিচিন্তা' —বিলাতী খ্রিষ্টান ও ভারতীয় হিন্দু', ১৯৫০-৫১)।

Digitized by srujan ka@gmail.com

দ্বারা সকলে একতা সূত্রে আবদ্ধ। এমন উদার ধর্ম আর বোধ হয় পৃথিবীতে নেই। অন্যান্য ধর্মের প্রসার লাভের জন্য যে রক্তপাত হয়েছে হিন্দুধর্মের জন্য তেমন আদৌ হয়নি। কারণ হিন্দুধর্মে প্রচারের কথা ওঠে না—যেহেতু পৃথিবীর সকলেই হিন্দু।

* * * * * * * * * *

যে সময়ে এক দিকে নানা মতবাদের উদ্ভব হয়ে সব ধর্মে অবসাদ বা বিভ্রান্তি নেমে এসেছে এবং অন্য দিকে নূতন ভাবধারা নূতন আশা এবং শান্তি ও সাম্যের আলোর উদয় হচ্ছে এই উপন্যাসের আখ্যায়িকাটি সেই সময়ের।

—বামাচরণ মিত্র

Digitized by srujan ka@gmail.com

॥ ১ ॥

বৌদ্ধরাজ্যের সুখিপল্লীতে আজ মহোৎসব।

পুণ্যতোয়া মহানদী পূর্ব-দক্ষিণগামিনী হওয়ার ঠিক পূর্বে যেখানে অর্ধবৃত্তাকার ধারণ করেছে সেইখানে নদীর দক্ষিণে এই বৌদ্ধরাজ্য। কিন্তু সুখিপল্লীতে আজ এ কিসের মহোৎসব বলবার পূর্বে অতীত ইতিহাসের কয়েকটি ছিন্নপত্র উলটিয়ে দেখতে হবে।

*　　　　*　　　　*　　　　*

মৌর্যমার্তণ্ড চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র ভারত জয় করে চব্বিশ বৎসর কাল সেই বিশাল রাজ্য সুশাসন করলেন। কিন্তু অন্তরে তৃপ্তি পেলেন না। সাম্রাজ্য, অতুল পার্থিব সুখ, সর্বাত্মক শক্তি সব পেয়েও তাঁর মনে হ'ল তিনি তবু বঞ্চিত। সর্বাপেক্ষা সুন্দর অবিনশ্বর কোনও এক বস্তু তাঁর অধিগত হয়নি। তাকে পাওয়ার জন্য তাঁর অন্তর ব্যাকুল হ'ল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি প্রথম একরাট্ রাজচক্রবর্তী, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। তার জন্য যত কুটিল চক্রান্ত, যুদ্ধবিগ্রহ ও পরে সুশাসন তার মূলে ছিলেন সেই যে কৃষ্ণকায় কুদর্শন দরিদ্র কিন্তু শাণিত ছুরিকার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণ। চাণক্য কৌটিল্য, গুরুদেব চাণক্য—তিনি আজ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন। এই কোলাহল, এই সাম্রাজ্য, এই অসীম ক্ষমতা আজ তাই চন্দ্রগুপ্তের কাছে কেবল এক বিরাট প্রহসন বলে মনে হচ্ছে। আজ তিনি যেদিকে তাকান তাঁর দৃষ্টিপথে কেবল একটি প্রশ্নবাচক চিহ্ন ভেসে উঠছে—এ সবের শেষ পরিণাম কি?

অন্যমনস্ক সম্রাট তাঁর সুরম্য উদ্যানে পথভ্রান্ত পথিকের মত ইতস্ততঃ পদচারণা করতে লাগলেন। এক সময়ে তিনি উদ্যান মধ্যস্থ দীর্ঘিকাকূলে একটি গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্তিতে হস্তার্পণ করে উদ্দেশ্যহীনভাবে চেয়ে রইলেন অসীম আকাশের দিকে।

এই অসীমকে জয় করবার অভিযান করব...

এমন সময়ে ধীর পদক্ষেপে তাঁর সমীপস্থ হলেন সেলিউকস্-নন্দিনী মহারাজ্ঞী হেলেনা। তাঁর সুডৌল গৌর হস্তে তিনি চন্দ্রগুপ্তের বাম বাহু স্পর্শ করতে তিনি চমকিত হয়ে পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ মুগ্ধ লোচনে চেয়ে রইলেন। এত দিনেও এই গ্রীসীয় প্রসূন তিলমাত্র ম্লান হয়নি, বরং ভারতের

Digitized by srujan ka@gmail.com

জলসিঞ্চিত পরিবেশে আরও মনোমুগ্ধকর হয়েছে।

ঈষৎ হেসে সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন,— দেবী, যুবরাজ বিন্দুসার কি করছে?

—বিন্দুসার অস্ত্রাগারে প্রশিক্ষণরত। সে সকল বিষয়েই মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সন্দেহ নাই। এ বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা ও শাসনের সে অধিকারী। —কিন্তু, কিন্তু—

হেলেনা অকস্মাৎ কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হয়ে অধোবদনে রইলেন।

সম্রাট সামান্য উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— দেবী, হঠাৎ নীরব হ'লে কেন? যুবরাজ কি তোমায় মাতার উপযুক্ত সম্মান দেয় না? আমি জানি তুমি বিদেশিনী ব'লে অনেকে আমাদের এ বিবাহের অনুমোদন করে নি। তারা বোঝে না যে ভারতের সঙ্গে গ্রীসের এভাবে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তার ফলে লোকসাধারণের চিন্তার পরিসর কত বেড়ে গিয়েছে। দেশপ্রেমের অর্থ নয় নিজেকে ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা। যাক সে কথা।—যুবরাজ কি বাক্যে বা কর্মে তোমার প্রতি কোনও অসম্মান প্রদর্শন করেছে? বল দেবী, নিরুত্তর কেন?

হেলেনা বললেন—না মহারাজ, আমি তা বলিনি। যুবরাজ বিন্দুসার আপনার সুযোগ্য পুত্র। আমি বিন্দুসারের পুত্র অশোকের কথা ভাবছিলাম। এখন সে বালক, সত্য; কিন্তু এখনই তার ক্রূর কর্ম ও চণ্ড প্রকৃতি দেখে আমি ভাবছি বিন্দুসারের পরে হয়তো বা এই সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে, মৌর্য সূর্য চিরতরে অস্তমিত হবে। হোমার-এর 'ইলিয়াড' মহাকাব্যের যে আখ্যান আমি আপনাকে পড়ে শুনিয়েছিলাম ভারতের কি তাই ঘটবে—বিন্দুসারের পরে? মাত্র এই কয়দিন পূর্বে অশোক তার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে যেমন নির্দয় হিংস্রভাবে প্রহার করেছে তা দেখলে আপনিও চিন্তিত হতেন। আমার ধারণা—

—তোমার ধারণা ভ্রান্ত, দেবী,—বাধা দিয়ে বললেন সম্রাট।—তুমি অশোকের বাহিরটা দেখেছ, তার অন্তরের দেখা বোধ হয় পাওনি। কর্কশ প্রস্তরের নীচে যে অন্তঃসলিলা ফল্গু প্রবাহিত তার সন্ধান পাওনি। যে দুর্দমনীয় আবেগের তাড়না অশোককে হিংস্র করেছে সেই দুর্দমনীয় আবেগই তাকে এক মহাশিক্ষা দেবে একদিন। দেবী, আমি ভবিষ্যদ্‌বাণী করছি অশোকের জন্য মৌর্যবংশ চিরস্মরণীয় হবে— কেবল ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে।...

বলতে বলতে সম্রাট হঠাৎ স্তব্ধ হলেন, তাঁর চক্ষু বাষ্পাকুল হ'ল, তাঁর দৃষ্টি পূর্ববৎ অসীমের দিকে প্রসারিত হল। অকস্মাৎ হেলেনার হস্ত ধারণ করে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন,—দেবী, দেবী, বৃথা আমার সাম্রাজ্য, বৃথা আমার শক্তি, বৃথা এই আড়ম্বর—যদি আমি চিরসত্যের সন্ধান না পেলাম—গুরুদেব হঠাৎ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন—

Digitized by srujan ka@gmail.com

এই সময়ে এক দৌবারিক এসে প্রণিপাতপূর্বক জানাল,—অর্হৎ ভদ্রবাহু মহারাজের দর্শনাভিলাষী হয়ে মন্ত্রণা গৃহে অপেক্ষারত।

চন্দ্রগুপ্তের বিষণ্ণ বদন সহসা উজ্জ্বল হল। অধীর আনন্দে তিনি বলে উঠলেন,—দেবী, দেবী, স্বর্গের দূত সমাগত। আমি এঁকেই স্মরণ করছিলাম। আমায় বিদায় দাও দেবী, আমি যাই।

হেলেনা চন্দ্রগুপ্ত বিষণ্ণভাবে সম্মতি দিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ক্ষিপ্রগতিতে প্রস্থান করলেন।

মন্ত্রণাগৃহে প্রবেশ করে চন্দ্রগুপ্ত অর্হৎ ভদ্রবাহুকে প্রণাম করলেন। 'আয়ুস্মান্ ভব' বলে অর্হৎ আশীর্বাদ করলেন।

ক্ষুব্ধ স্বরে চন্দ্রগুপ্তকে বললেন,—আপনার আশীর্বচন প্রত্যাহার করুন, অর্হৎ। আয়ুতে আমার প্রয়োজন নেই।

স্মিতহাস্য করে ভদ্রবাহু বললেন,—বৎস, আয়ু এ নশ্বর শরীরে থাকে না, থাকে কর্মে। রাজ্যের নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ, মহামারী। আমি সে জন্য ভিক্ষা চাইতে এসেছি। আমার সময় স্বল্প। অচিরে ভিক্ষা দিয়ে আমায় বিদায় দাও।

সম্রাট অতীব আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন,—সে কি কথা, মহাভাগ! আমার রহস্যাধিকৃত গুপ্তচরগণ আমায় যে সপ্তাহান্তিক প্রতিবেদন দেয় সে সমস্ত থেকে আমি তো জানি রাজ্যের সর্বত্রই সুখশান্তি অব্যাহত আছে!

ভদ্রবাহু হস্তোগুল করে চন্দ্রগুপ্তকে নীরব হতে ইঙ্গিত করে ম্লান হাসি হেসে বললেন,—বৎস, প্রজার মঙ্গল যদি তোমার অন্তরের বাসনা হয়ে থাকে তবে কেবল কর্মচারিবর্গের প্রদত্ত সংবাদের উপর নির্ভর করলে মহাভ্রমে পড়বে সন্দেহ নেই। কর্মচারিগণ সদা স্বার্থান্বেষী, আপন স্বার্থসাধন নির্মিত্ত তারা কখন বা মিথ্যা সংবাদও দেয়। যে রাজা তাদের প্রতিবেদনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন তিনি সহসা একদিন প্রজাবিদ্রোহ দেখে ভীত হয়ে নির্মম দমনলীলা আরম্ভ করেন। কদাপি প্রজাদের সুখদুঃখের প্রকৃত সংবাদ তিনি জ্ঞাত না থাকায় এই বিদ্রোহকে চক্রান্ত ব'লে ভ্রম করেন। দুঃখের বিষয়, আমি লক্ষ করছি যে এ বিষয়ে কৌটিল্যের উপদেশ আর পালিত হচ্ছে না। যাই হোক, সম্রাটের কর্তব্য সম্রাট বুঝবেন। আমার ভিক্ষা চন্দ্রগুপ্তের কাছে।

বিমর্ষভাবে চন্দ্রগুপ্ত বললেন,—তুচ্ছ সম্রাটত্ব ভিন্ন চন্দ্রগুপ্তের আর নিজস্ব কিছু নাই। তবু আমি প্রতিজ্ঞা করছি, চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে নিরাশ করবে না। তাকে আদেশ করুন, মহাভাগ।

অর্হৎ ভদ্রবাহু দণ্ডায়মান হলেন। বললেন,—বৎস, আমার ভিক্ষা চন্দ্রগুপ্ত। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত নয়, মানুষ চন্দ্রগুপ্ত। পারবে বৎস, এই ভিক্ষা দিতে?

আনন্দিত চিত্তে চন্দ্রগুপ্ত বললেন,—দেব, আপনি দেবদূত! আমি এই মুহূর্তে

Digitized by srujan ka@gmail.com

যুবরাজ বিন্দুসারকে সাম্রাজ্যভার অর্পণ করে ভিক্ষাপাত্র হস্তে আপনার অনুগামী হব। আমার সমস্ত জীবন যে মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করে ছিল সেই মহা মুহূর্ত আজ উপস্থিত। এর চাইতে বেশী আনন্দ আর কি হতে পারে!

অল্পকালের মধ্যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত কার্য সমাধা করে পুত্র বিন্দুসারকে রাজ্যার্পণ ক'রে ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভদ্রবাহুর অনুগমন করলেন এবং সহস্রাধিক জৈন ভিক্ষুর সঙ্গে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করলেন। মগধ বিদর্ভ ও মহাকোশলে তখন দুর্ভিক্ষ তার করাল মূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর উপজনবর্গ তার গতি রোধ করতে অক্ষম হলেন। দক্ষিণাপথে শ্রাবণ-বেলগোলায় উপবাস অবলম্বন করে তিনি অবশেষে উপবাসেই প্রাণত্যাগ করলেন।

•

একদিন দ্বিপ্রহর বেলায় কলিঙ্গদেশের পশ্চিম অংশের প্রায় প্রান্তবর্তী সুখিপল্লী নামক এক অখ্যাত জনপদের অধিবাসীরা দেখল এক অশ্বারোহী যুবক সঙ্গে শতাধিক অশ্বারোহী নিয়ে নিকটস্থ অরণ্যের নিবিড় ছায়াতলে বিশ্রামের নিমিত্ত এসে থামল। যুবকের দৃপ্ত ভঙ্গি কিন্তু তৎসহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গাম্ভীর্য থেকে অনুমান হয় সেই দলের নেতা ও পথপ্রদর্শক। তার লৌহমূর্তিবৎ দেহের নীচে দুই চক্ষুর অচঞ্চল দৃষ্টি জনপদবাসিগণের চিত্ত আকর্ষণ করল। আশ্চর্য, যুবকের কোলে অপূর্ব কমনীয় এক শিশু।

বিশ্রামরত আগন্তুকদের চারিদিকে কুতূহলী জনতার সমাবেশ হ'ল। তাই দেখে নেতৃকল্প সেই যুবক উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্দেশ্যে করে বলল,—বন্ধুগণ, আমার নাম ক্ষেমরাজ ঐর, চেতি বংশে আমার জন্ম। আমি ও আমার সহযাত্রিগণ মহাকোশলবাসী। আপনারা বোধহয় অবগত নন যে বিদর্ভ মগধ বিদিশা ও মহাকোশল দুর্ভিক্ষ কবলিত। বহু লোক এই দুর্ভিক্ষে মৃত্যু বরণ করেছে। আমার ভার্যাও মৃতা। কেবল আমার এই শিশুপুত্র বর্ধরাজ ও আমি জীবিত। আমি ও আমার সহগামিগণ স্বদেশ ত্যাগ করে দক্ষিণে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েছি। তবে আপনাদের এই দেশকে যেন আমার স্বদেশ বলে প্রতীতি হচ্ছে। এই উর্বর সুশ্যামল ভূমি, পয়স্বিনী নদী, নিবিড় অরণ্য, নিরভিমান অধিবাসিগণ সকলই আমায় মুগ্ধ করেছে।

তখন পল্লীবাসীদের মধ্য থেকে মণিভদ্র নামক এক যুবক এগিয়ে এসে ক্ষেমরাজের হস্ত ধারণ করে বলল,—বন্ধু, তুমি ও তোমার সাথীরা নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বিশ্রাম কর। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে তোমাদের সকলের জন্য খাদ্য-পেয়র ব্যবস্থা করছি।

এই বলে মণিভদ্র দেখতে দেখতে সেই অরণ্যের ভেতর অন্তর্হিত হ'ল। কতক্ষণ পরে সে এক মহিষযোজিত শকটে চারটি মৃত মৃগ, প্রচুর তণ্ডুল, কাষ্ঠ, কলস ও

Digitized by srujan ka@gmail.com

মৃন্ময় পাত্র নিয়ে ফিরে এল এবং অবিলম্বে লোকজন নিয়ে রন্ধনের আয়োজন করতে লাগল। ক্ষেমরাজ ও তার অনুচরগণ প্রথমে তাদের অশ্বগুলিকে খাইয়ে বৃক্ষকাণ্ডে বেঁধে রেখে তার পর নিজেরা স্নান করে সানন্দে ভোজন সমাধা করল। ভোজনান্তে আর কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তারা আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। বিদায়ক্ষণে ক্ষেমরাজ মণিভদ্রের হস্ত ধারণ করে বলল,—বন্ধু, এ উপকার আমি ভুলব না। যদি সুদিন আসে......বলতে বলতেই তার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হ'ল। মুহূর্তের জন্য তার তীক্ষ্ণ চক্ষুদুটি যেন অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেই আবার শান্ত হ'ল। মণিভদ্রকে আলিঙ্গন করে ক্ষেমরাজ ঐর অশ্বারোহণ করল এবং শিশুপুত্র বর্ধরাজকে কোলে বসিয়ে অশ্বচালনা করল।

এই ঘটনার এক মাস পরে ক্ষেমরাজ ও তার অনুচরগণ খণ্ডগিরির *নিকটস্থ একপ্রস্তর নামক স্থানে উপনীত হয়ে সে স্থান বাসযোগ্য বিবেচনা করে সেইখানে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগল।

ক্রমে আপন বুদ্ধি ও বাহুবলে ক্ষেমরাজ ও তৎপুত্র বর্ধরাজ কিরূপে সে অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করলেন সে ইতিহাস রোমাঞ্চকর বটে, কিন্তু এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তাঁদের রাজত্ব ঐর** রাজবংশের প্রথম বা আদিপুরুষের যুগ। ক্রমে ক্রমে ঐর রাজ্য বিস্তারলাভের ফলে কিছুকালের মধ্যে উত্তরে মহানদী পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল ঐর রাজবংশের বশ্যতা স্বীকার করল।

রাজা হয়ে ক্ষেমরাজ তাঁর উপকারী মণিভদ্রকে ভুলে যাননি। সুখিপল্লী ও অন্যান্য সমস্ত জনপদ ক্ষেমরাজের রাজ্যভুক্ত হওয়ার পরে তিনি মণিভদ্রকে সে স্থানের গ্রামণী নিযুক্ত করলেন।

তত দিনে মগধ-সম্রাট বিন্দুসারের মৃত্যু ঘটেছে। মৌর্যসূর্য চন্দ্রগুপ্ত সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করলেও কলিঙ্গদেশ জয় করতে পারেননি। মহারাজ বিন্দুসারও কলিঙ্গকে নিজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে অক্ষম হয়েছিলেন। এই দেশের নিরভিমান সরল জাতি যেমন কৃষিকার্য ও কলাকৃতিতে নিপুণ, যুদ্ধে তেমনই দুর্ধর্ষ। বিন্দুসারের পরে তৎপুত্র অশোক তাঁর ভ্রাতাদের হত্যা করে সম্রাট হয়ে প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন কলিঙ্গের দিকে।

একদিন বৃদ্ধ কলিঙ্গরাজ ক্ষেমরাজ ঐর সবিস্ময়ে দেখলেন চলন্ত পর্বতশ্রেণীর মত অশোকের বিপুল সেনা কলিঙ্গে প্রবেশ-উদ্যত। ক্ষেমরাজের আদেশে

* বর্তমান ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরের পশ্চিম উপকণ্ঠে খণ্ডগিরি—উদয়গিরি নামক অনতিউচ্চ পর্বতদ্বয়ের প্রথমটি। দ্বিতীয়টি উদয়গিরি সম্রাট খারবেলের শিলালিপির জন্য প্রসিদ্ধ।

** ঐর—ইয়ার (পৃথিবী) পুত্র।

Digitized by srujan ka@gmail.com

কলিঙ্গসেনা অচিরে তার প্রতিরোধে অগ্রসর হ'ল। গ্রামণী মণিভদ্রও তাঁর সেনাসহ ক্ষেমরাজের সহিত যোগ দিলেন। মগধ ও কলিঙ্গসৈন্যের মধ্যে সেই নিষ্কারুণ যুদ্ধ ও কলিঙ্গসেনার নিদারুণ রক্তক্ষয়ের কাহিনী ইতিহাস পাঠকের সুপরিজ্ঞাত। সেই যুদ্ধের ফল এক পক্ষে হ'ল কলিঙ্গের পরাভব, কিন্তু অপর পক্ষে তা হ'ল ভারত তথা জগতের পক্ষে মহাকল্যাণকর। আপন ভয়ঙ্কর ও বীভৎস কর্মের শোচনীয় পরিণতি দর্শনে চণ্ডপ্রকৃতি অশোক একান্ত অনুশোচনাক্লিষ্ট হয়ে ধর্মাশোকে পরিণত হলেন। অবশেষে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তাঁর আপন পুত্র ও কন্যাকে ধর্মপ্রচারার্থ দূরদূরান্তরে প্রেরণ করলেন।

এই যুদ্ধে ক্ষেমরাজ ও বর্ধরাজ পিতা ও পুত্র উভয়েই নিহত হলেন। সে শোচনীয় সংবাদ পেয়ে বৃদ্ধ গ্রামণী মণিভদ্রও দুঃখে প্রাণত্যাগ করলেন। এর পরে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে কলিঙ্গের রাজা হলেন ইন্দ্ররাজ ও তাঁর পরে তৎপুত্র ধর্মরাজ। তাঁদের রাজত্বকাল ঐর রাজবংশের দ্বিতীয় বা উত্তরপুরুষের যুগ। মণিভদ্রের মৃত্যুতে ইন্দ্ররাজ মণিভদ্রের পুত্র শ্রীভদ্রকে প্রাদেশিক পদে নিযুক্ত করলেন। শ্রীভদ্র সম্রাট অশোকের প্রচারিত বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হয়ে সেই ধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং তাঁর শাসনাধীন অঞ্চলের নাম দিলেন বৌদ্ধ, গৌরবে বৌদ্ধরাজ্য।

কালক্রমে ইন্দ্ররাজ ও ধর্মরাজ প্রাণত্যাগ করলেন, কলিঙ্গের অধিপতি হলেন বীর মহারাজ মহামেঘবাহন শ্রীখারবেল ঐর।

ততদিনে বৌদ্ধরাজ্যের প্রাদেশিক শ্রীভদ্রের অন্তে নূতন প্রাদেশিক সুভদ্র। সুভদ্রের অন্তরের বাসনা তিনি রাজুক অর্থাৎ সামন্ত রাজা হবেন ও আপন রাজ্য সুবিস্তৃত করবেন।

॥ ২॥

বৌদ্ধরাজ্যের সুখিপল্লীতে আজ মহোৎসব।

রাত্রি প্রভাত হ'তে না হ'তে পল্লীবাসীরা মনোহর বেশে সজ্জিত হয়ে উৎসব স্থলীতে যাত্রা করেছে। যুবকেরা রক্তিম অন্তর্বাস ও পীত উত্তরসঙ্গ পরিধান ও কুঞ্চিত কেশ সুগন্ধিত করে সহাস্য বদনে চলেছে। যুবতীদের পরিধানে দ্রাপি ও তদুপরি ঝিনবাস, অঙ্গে মেখলা কেয়ূর কঙ্কণ আদি অলঙ্কার ও হস্তে লীলাকমল ধারণ করে মরালগমনে যুবকদের আগে আগে চলেছে। সূক্ষ্ম ঝিনবাসের নীচে তাদের তরঙ্গিত যৌবনলাবণ্য পরিস্ফুট। পশ্চাৎ হতে সেই অলসগমনাদের সুবর্তুল অঙ্গ শোভা সঞ্চালনে নিবদ্ধদৃষ্টি যুবকেরাও তাই সুমন্দগমন। উপরন্তু মন্দ পবনে যুবতীকুলবিকীর্ণ অঙ্গবাস তাদের দেহে মনে এক অপূর্ব অতৃপ্তির পুলক শিহরণ

Digitized by srujan ka@gmail.com

জাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কোনও অধীর যুবক বা তার হস্তস্থিত প্রিয় পারাবতটিকে বারংবার চুম্বনে অস্থির করে তুলছে। কোনও লীলাময়ী অপাঙ্গ দৃষ্টিতে পশ্চাদবলোকন করে আপনাদের মধ্যে হাস্যলহরীতে হিল্লোলিত হচ্ছে।

কিন্তু কিসের জন্য আজকের এই উৎসব? বহুকাল পারে আপন জন্মস্থান এই সুখিপল্লীতে প্রত্যাগমন করছেন দুই মহাযশস্বী পুরুষ যাঁদের কারণে গর্বিত সুখিপল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা। তাঁদের একজন মহাকাঞ্চন, অপর জন তাঁরই অনুজ মহাশাল। মহাকাঞ্চন মহাযোগী, মগধাধিপতি পুষ্যমিত্রের রাজগুরু। আর মহাশাল স্বয়ং কলিঙ্গরাজ খারবেলের মহাসৈন্যাধ্যক্ষ। তাঁদের আনন্দবর্ধনের জন্য পল্লীবাসীরা পল্লীপ্রান্তে উন্মুক্ত প্রান্তরে নানা ক্রীড়া ও মল্লকৌশল প্রদর্শন, যুবতীদের নৃত্যগীত, এবং সন্ধ্যাগমে প্রীতিভোজের আয়োজন করেছে।

পল্লী তাই আজ এক প্রকার নির্জন। কেবল এক বহুকাল পরিত্যক্ত মন্দিরে এক ষোড়শী যুবতী প্রার্থনারতা। তার গন্ড অশ্রুপ্লাবিত। পরিত্যক্ত মন্দির বিগ্রহশূন্য, কোনও দেবদেবীর মূর্তি সেখানে নেই, পূজা-অর্চনাও নেই। কেউ কেউ বলে সে কোন এক বিস্মৃত যুগে কোনও বোধিসত্ত্ব এখানে নির্বাণলাভ করেছিলেন। কেউ বা বলে ভগবান বহুকাল পূর্বে এই মন্দিরে রুদ্ররূপে পূজা পেতেন। কিংবদন্তি, যাই থাক, এখন এই পরিত্যক্ত মন্দির কেবল সর্পশৃগালের নিরাপদ আবাসে পরিণত। মন্দিরের সোপানশ্রেণীতেই যুবতী প্রার্থনা করছিল। প্রার্থনা শেষে সে মন্দিরগাত্র ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল কিন্তু না পেরে আবার বসে পড়ে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

দূর থেকে ভেসে আসছে উৎসবপথযাত্রী যুবকযুবতীদের গান ও বাঁশরীর সুর। সকলেই উৎসবস্থানে চলেছে, কেবল সে অক্ষম, সে চলৎশক্তিরহিত। দুঃখাবেগে তার বক্ষ স্ফীত হল, অধরপ্রান্ত কম্পিত হল, দুই বিন্দু অশ্রু তার মসৃণ কোমল গাল বেয়ে এসে উন্নত বক্ষের উপরে পড়ল।

অকস্মাৎ মন্দিরের ভিতর থেকে আসা এক অত্যুজ্জ্বল আলোকছটায় সে চমকিত হ'ল। এ কি বিদ্যুৎ ঝলক? কিন্তু আকাশ তো সুনির্মল। সূর্যদেব তাঁব স্বর্ণকিরণজাল বিস্তার করেছেন। চমকে ওঠার ফলে তার আসাযষ্টি দু'খানি হাত থেকে প'ড়ে সোপানশ্রেণী দিয়ে গড়িয়ে নিচে গিয়ে পড়েছে। সে দুটি কুড়াতে আবার শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে একটি একটি করে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নামতে হবে। আজ তার দুর্ভাগ্য যেন দ্বিগুণিত। পুনরায় অতিশয় ক্রন্দনের বেগে সে মন্দির-সোপানে মাথা কুটতে লাগল।

—তুমি কাঁদছ কেন?

সচকিত হয়ে যুবতী মুখ তুলে চেয়ে দেখল এক অপরূপ কমনীয়কান্তি বালক,

Digitized by srujan ka@gmail.com

তার অতি নিকটে। বর্ষার নূতন মেঘের মত তার শ্যাম কান্তি। দেহে পীত বসন ত্রিকচ্ছরূপে পরিহিত। দুইখানি পা লাক্ষারসে রঞ্জিত, কণ্ঠে বনমল্লিকার মালা। কুঞ্চিত কেশদামের দুই একটি চূর্ণকুন্তল মন্দবায়ুতে আন্দোলিত, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ। মুখমন্ডলে অপূর্ব শোভা ও অধরে মোহময় স্মিতহাস! যেন মন্দিরের সেই আলাকোল্লাস থেকেই আবির্ভূত এই অপূর্ব সুন্দর সুঠাম কিশোর বিগ্রহ!

—কেঁদো না। কি নাম তোমার?

—চম্পা।

—সুন্দর নামটি! গ্রামের সকলেই উৎসবে গেছে, তুমি যাওনি যে?

—আমি যে চলতে পারি না, অকর্মণ্য। নয় তো আমি মা আর মধুকাকার সঙ্গেই তো যেতে পারতাম। তবু আমি নিজেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু আর চলতে না পেরে এইখানে এসে বসে আছি! তা, তুমি কে, ভাই? কোথা থেকে এলে? মন্দিরে তো আর কেউ ছিল না!

বালক খিলখিল করে হেসে উঠল। সে হাসিতে চম্পার সমস্ত ক্ষোভ-দুঃখ যেন নিমেষে দূর হয়ে গেল।

—বাঃ, তুমি তো প্রার্থনা করছিলে, আমি কি দেখিনি?

—আমি এমনি অচল হয়ে পড়ার পর প্রতিদিন এখানে আসি—প্রার্থনা করতে। রোজ বলি, হে ভগবান, আমার প' ফিরিয়ে দাও। এই বলে নিজের পায়ে ভর দিয়েই দাঁড়াবার চেষ্টা করি।

—তোমার ভগবান কে?

চম্পা চিন্তিত হ'ল। ভগবান তো ভগবানই, কে আবার কি! চম্পাকে চিন্তিত হতে দেখে বালক হেসে বলল,—আচ্ছা তোমার ভগবান যিনিই হোন, তুমি কি ঠিক জানো যে তাঁকে ডাকলে তিনি তোমার পা ফিরিয়ে দেবেন?

—সবাই তো তাই বলে। আমারও তাই বিশ্বাস।

বালক এবার হাসতে হাসতে চম্পার কোলে এসে বসে পড়ল। চম্পা স্নেহভরে তার মস্তক আঘ্রাণ করে তাঁর মুখখানি তুলে ধরে বালকের অপূর্ব কমনীয় রূপের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

আজ অবধি চম্প কাউকে সাহস করে তার আপন জীবনের করুণ কাহিনী বলতে পারে নি। কারণ কখনও কেউ তাকে একবার আহা বলেনি। সে সকলের উপেক্ষিতা। আর আজ কিনা এই অদৃষ্টপূর্ব বালক তার কোলে এসে বসেছে! তার মনে হল যেন এ তার আপন মায়ের পেটের ভাই। হোক না সে বালক, তার কাছেই আজ সে আপন হৃদয় উন্মুক্ত করবে। মুহুর্মুহুঃ অশ্রুপাতের মধ্যে চম্পা তার দুঃখের কাহিনী প্রকাশ করে বলল।

Digitized by srujan ka@gmail.com

সুখিপল্লীর লাঙ্গলীশ নামক এক কৃষকের একমাত্র সন্তান চম্পা। চৌদ্দ বৎসর পূর্বে যখন সে মাত্র দুই বৎসরের শিশু তখনই সে তার পিতাকে হারায়। তাই অতি অল্প বয়স থেকেই তাকে তাদের এই কৃষি-সংসারের নানা কাজ করতে হয়েছে। তার পর এই দুই বৎসর আগের কথা, একদিন গাই বাঁধতে গিয়ে গাই তাকে শিঙ দিয়ে তুলে ফেলে দেয়। একটা পাথরের উপর পড়ে তার দুটি পা থেকে সামান্য রক্তপাত হয়। সবাই বলল, ও কিছু নয়, দুই তিন দিনেই সেরে যাবে। কিন্তু সেই দিন রাত্রে তার জ্বর এল। সেই জ্বর দুই তিন দিনে সেরে গেল বটে, কিন্তু চম্পা আর উঠতে পারল না, সেই অবধি তার পা দুখানি যেন নিষ্প্রাণ দুখানি কাষ্ঠখণ্ডের মত কেবল তার দেহলগ্ন হয়ে রয়েছে। পল্লীর বৈদ্য বললেন পূর্বজন্মে কৃত কোনও পাপের ফলে তার এই অবস্থা হয়েছে। এ দৈবদন্ড, তিনি এর প্রতিকারে অক্ষম। চম্পার দুর্দশায় সকলে নাসিকা-কুঞ্চিত ক'রে যে যার পথে চলে যায়, যেন তার পূর্বজন্মের সেই অজ্ঞাত পাপের কথা তারা আগে হতেই জানত।

বালক সব শুনে হেসে বলল,—পা যদি গিয়ে থাকে তো যাক, হাত দুখানা তো আছে।

চম্পা বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল,—হাঁ, হাত দুখানা আছে, নইলে তো আমি কবে থেকে মরেই যেতাম। আসলে, আমি আমার পায়ের জন্য কাঁদি না। কাঁদি......

চম্পা আর বলতে পারল না, নীরবে অশ্রুপাত করতে লাগল। বালক কিছুক্ষণ নীরব থেকে তারপর কাঁদ কাঁদ হয়ে চম্পার চিবুক ধরে বলল,—বল না কেন কাঁদছ।

চম্পা চোখ মুছে বলল,—তুই তার কি বুঝবি রে, ছেলেমানুষ তুই। আমি যাকে ভালবাসতাম আমার পা যাওয়ার পর থেকে সে আর আসে না।

—বুঝেছি, বুঝেছি। বলে বালক আবার তেমনি খিল খিল করে হেসে বলল,—কিন্তু যে তোমাকে দুঃখের সময়ে ছেড়ে চলে গেছে সে কখনো তোমায় ভালবাসত না।

—না রে, না। সে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালেবাসে। সে কে জানিস? সে এই গ্রামের কৃষক শিবির পুত্র চন্দ্র। সৌগত শিবি ভারী হিসাবী। চন্দ্রের সঙ্গে আমার বিবাহে তাঁর একেবারে মত নেই, কারণ আমরা তো তাঁকে একটি কপর্দকও দিতে পারব না। কিন্তু আমার সঙ্গে বিবাহ না হলে চন্দ্র বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে চলে যাবে বলাতে শিবি বাধ্য হয়ে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ঠিক এই সময়েই আমার অদৃষ্টের দোষে আমার এই দুর্দশা হল। পুরুষ চিরদিনই পুরুষ। কোন পুরুষ এমনি অকর্মণ্য স্ত্রী ঘরে নিয়ে যাবে—চিরকাল পুষবার জন্য? তায় আবার আজকালকার এই দুর্দিনে? চন্দ্রের দোষ কি? সবই আমার ভাগ্যের দোষ। আমি তো তার ঘরে গিয়ে সামান্য কাজটুকুও করতে পারব না। তাই সৌগত শিব চন্দ্রের বিবাহ এই গ্রামেরই এক

Digitized by srujan ka@gmail.com

ধনীর মেয়ের সঙ্গে স্থির করেছেন। তাকে দেখেছিস তুই? আমি তাকে দেখিনি।

—সে কে আমি কি করে জানব যে দেখব?

—ধনীর মেয়ে হলে কি হবে, ভারী কালো কুৎসিত নাকি সে।

—তুমি না তাকে দেখ নি? কালো কুৎসিত ব'লে জানলে কি ক'রে? আর কালো হলেই কি কুৎসিত হয়?

চম্পা ভাবল তাই তো! এই পরম সুন্দর বালকও তো কালো। কেন তার খেয়াল হয়নি এ কথা!

এই সময়ে সুদূর থেকে ভেসে এল উৎসবের শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি। চম্পা তার অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে বলল,—যা ভাই, তুই উৎসবে যা।

—যাব না, আমার যেতে ইচ্ছা নেই—বলল বালক।

চম্পা বড় আশ্চর্য হ'ল, তার কাহিনী শুনে কি বালকটির এতই দুঃখ হ'ল? সে এবার তার দিকে ভাল ক'রে চেয়ে বলল,—তোর ঘর কি এই গাঁয়ে?

—না।

—আমিও তাই ভাবছিলাম। আমি তো এ গাঁয়ের সবাইকেই চি নি, তোকে তো আগে কখনো দেখিনি।

বালক এ কথার উত্তর না দিয়ে বলল—দিদি, তুমি তোমার পা দুখানি ফিরে পেতে চাও?

চম্পা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—পা, ফিরে পেতে আমি আমার সর্বস্ব দিতে পারি—পা দুটোর জন্য নয়, পা ফিবে পেলে আমি যে আমার চন্দ্রকে ফিরে পাব!

তা হ'লে তোমার পা তুমি কি ক'রে ফিরে পাবে বলি শোন। এই গাঁয়ের ব্রাহ্মণ সোমদত্তের তিন ছেলের মধ্যে যে সব চাইতে ধার্মিক সে যদি তোমায় তোমার আসাযষ্টি ফেলে দিয়ে চলতে আজ্ঞা করে, তাহ'লে তুমি তোমার পা ফিরে পাবে।

এই শিখিপুচ্ছধারী অমিয়বচন কিশোর বালকের আশ্চর্য আবির্ভাব, অপূর্ব মোহন রূপ ও অন্তরঙ্গ বাক্‌ভঙ্গিতে চম্পা মুগ্ধা হয়েছিল, তার কথায় তার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মাল।

বিস্ময়বিহ্বল নয়নে সে যখন বালকের দিকে চেয়ে আছে সেই সময়ে মন্দিরাভ্যন্তর থেকে আবার হ'ল সেই আকস্মিক রশ্মিসম্পাত! তীব্র আলোকে চম্পার চক্ষু নিমীলিত হ'ল। তারপর চক্ষুরুন্মীলন করে সেই দিব্য বালককে সে আর দেখতে পেল না। যেই সে আকাশের নীলিমায় বিলীন হয়েছে। রেখে গেছে তার কণ্ঠের বনমল্লীকামালার অপূর্ব সুবাস!

চম্পা এক অপার্থিব আনন্দে উচ্চস্বরে বলে উঠল,—স্বয়ং ভগবান! বলে যুগপৎ কাঁদতে ও হাসতে লাগল।

Digitized by srujan ka@gmail.com

এই আশ্চর্য সংবাদ তৎক্ষণাৎ তার প্রিয় মধুকাকাকে আর মাকে দেবার জন্য সে তার খঞ্জতা ভুলে হঠাৎ ছুটতে গিয়ে মন্দিরের সোপানশ্রেণী দিয়ে গড়িয়ে নীচে গিয়ে পড়ল। সেখানে সে তার আসাযষ্টি দুখানি পেয়ে আর ভাগ্যক্রমে বেশী আঘাত লাগেনি দেখে চোখ মুছতে মুছতে তার পক্ষে যথাসাধ্য দ্রুত গতিতে গৃহের দিকে চলল, কিন্তু ফিরে গৃহ শূন্য দেখার পর তার স্মরণ হ'ল মা আর মধুকাকা তো উৎসবে গেছে। তখন সে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে অনুভব করল সে ক্ষুধার্ত। কিছু যবসক্তু ও একখানি পুরোডাশ বাড়ীতে ছিল, তাই খেয়ে জল পান করল। তখন তার চোখে পড়ল এক কোণে তার মধুকাকার লুকিয়ে রাখা এক পাত্র মাধ্বী। সে তাও পান করল। দীর্ঘক্ষণ উত্তেজনার ফলে সে ক্লান্ত হয়েছিল, তদুপরি এখন সুরা পান করে সে তন্দ্রাগ্রস্ত হয়ে অচিরে নিদ্রিত হল।

চম্পা অতি দরিদ্র ঘরের কন্যা। এক বেলা উদরপূর্তি হয় তো আর বেলা হয় না। মাসের মধ্যে অনেক দিনই তাকে অভুক্ত থাকতে হয়। চম্পার মা বহু কষ্টে সংসার চালায়। তবে মেঘ যখন এসে পূর্ণচন্দ্রকে ঢাকে পূর্ণচন্দ্রের শোভা অধিক হয়। দারিদ্র্য সত্ত্বে কিশোরী চম্পার রূপ-লাবণ্য দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। যুবক যুবতীরা চেষ্টাপূর্বক তাদের কেশপাশ কুঞ্চিত করে, কিন্তু চম্পার আগুল্‌ফলম্বিত ঘনকৃষ্ণ কেশ স্বভাবতঃই কুঞ্চিত। চম্পার দেহবর্ণ চম্পা ফুলের মতই। আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগল। তার দক্ষিণগণ্ডে একটি তিল চিহ্নে তার মুখমণ্ডলের শোভা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কবির বর্ণনায় হয়তো সে তিলচিহ্ন কোনও এক ভ্রমর যে সেই মুখপদ্মের লোভে সেখানেই চিরলগ্ন হয়ে আছে। পল্লীর তরুণদের মতে কিন্তু তা আদৌ তিলচিহ্ন নয়, ভ্রমরও নয়; সে কেবল তাদের সকলের দগ্ধ হৃদয়ের ভস্মতিলক।

কিশোরী চম্পার রূপ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। এদিকে চম্পার মা বেশী কাজকর্ম করতে ক্রমশঃ অক্ষম হয়ে পড়ায় সহায়তার আশায় তার প্রয়াত স্বামীর দূর সম্পর্কীয় ভাই মধুকরকে এসে ঘরে রাখল। কিন্তু অন্তরে যে আজন্ম অনিকেত তার কাছে তেমন আশা করা বোধ হয় বিড়ম্বনা। সহায়তা যত না হল তত মধুকর হল বোঝার উপর শাঁকের আঁটি। কখন সে ঘরে থাকে কখন সে থাকে না, হঠাৎ ক্ষুধার্ত হয়ে এসে বলে 'হা অন্ন'! চম্পাকে কিন্তু সে বড় ভালবাসে।

ব্রাহ্মণ সোমদত্তের তিন পুত্রের জ্যেষ্ঠ মহাকাঞ্চন ও মধ্যম মহাশাল—যে দুই জনের আগমনে সুখিপল্লী আজ উৎসবমুখর। মধুকর এই মহাকাঞ্চনের বাল্যসাথী। একদা মহকাঞ্চনের সঙ্গে সেও সুদূর পাটলিপুত্রে গিয়েছিল—সেখানে নগর-উপকণ্ঠে মহর্ষি পতঞ্জলির আশ্রমে যোগ শিক্ষা করত। কিন্তু মধুকর শিশুকাল থেকেই অন্য প্রকার, কোনও কর্ম বা অবস্থা তার বেশী দিন ভাল লাগেনা। তার স্বভাব আকাশের মুক্ত বিহঙ্গমের মত। পতঞ্জলির আশ্রমে তার উপস্থিতি অন্যান্য শিষ্যদের যোগাভ্যাসে

Digitized by srujan ka@gmail.com

বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। মহর্ষি শত চেষ্টা করেও মধুকরের অস্থির চিত্তকে স্থির রাখতে পারলেন না। একদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে আশ্রমস্থ শিষ্যগণ যখন ধ্যানাভ্যাসে রত, পতঞ্জলি দেখলেন মধুকর তখন সুরাপানে রত। মহর্ষি মধুকরের স্কন্ধে ধীরে হস্তার্পণ করে বললেন, —বৎস, 'যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'।

মধুকর অম্লান বদনে পাত্র নিঃশেষ করে বলল,—গুরুদেব, 'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র', এ কথাও আপনি বলেছেন। নিজে সকল পদার্থের মধ্যে এবং সকল পদার্থ নিজের মধ্যে বিদ্যমান এইরূপ জ্ঞান করতে আপনি উপদেশ দিয়েছেন। তদ্ব্যতীত, আমি আবিষ্কার করেছি যে সুরাপান ধ্যানের সহায়তা করে।

—বৎস, যোগের উদ্দেশ্য কৈবল্যপ্রাপ্তি। সবেতেই থেকে তবু কোনও কিছুতে না থাকার অবস্থা কৈবল্য বলে কথিত। যে চিত্তবৃত্তি অবিদ্যাদি ক্লেশের কারণ তা ক্লিষ্ট এবং যা তার বিপরীত তা অক্লিষ্ট। বৈধ মনোবৃত্তি অক্লিষ্ট ও অবৈধ চিত্তবৃত্তি ক্লিষ্ট।

এইমাত্র বলে পতঞ্জলি মধুকরের মস্তকে কিয়ৎক্ষণ তাঁর হস্তরক্ষা করে স্মিত হাস্য করে চলে গেলেন।

মধুকর কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তার পর আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সে সময়ে তার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর।

আশ্রম ত্যাগ করে সে এক বৌদ্ধ বিহার বা সঙ্ঘারামে আশ্রয় ছিল। কিন্তু সেখানেও তার বেশী দিন থাকা চলল না। একদিন আশ্রমপাল মধুকরকে এক ভিক্ষুণীর সঙ্গে অসংযত অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি মধুকরকে প্রতিমোক্ষ পালন দ্বারা পাপ ক্ষালনের আদেশ দিলেন। কিন্তু মধুকর আপন কার্যকে পাপ বলে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক হওয়ায় আশ্রমপাল তাকে সঙঘারাম থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হলেন। ভিক্ষুর পীত বসন ও ভিক্ষাপাত্র ফিরিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার সময়ে মধুকর সেই ভিক্ষুণীকে সঙ্গে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করল। কিন্তু অন্যান্য ভিক্ষু ও আশ্রমপাল স্বয়ং তাতে ঘোর আপত্তি করায় মধুকর দুঃখিত চিত্তে একাকীই বিহার ত্যাগ করল।

অতঃপর মধুকর এক ভ্রাম্যমান যাত্রার দলে যোগ দিল। যাত্রাভিনয় করে দুই বৎসর যাবৎ বহু দেশ ভ্রমণের পরে এক দিন সে অসুস্থ অস্থিচর্মসার অবস্থায় সুখিপল্লীতে ফিরে এল। শিশুকাল থেকে সে পিতৃমাতৃহীন, আপনার বলতে তার কেউ নেই। তাই নিজগ্রামে অল্পদিন থাকবার পর সুস্থ হয়ে উঠতেই তার মন পুনরায় চঞ্চল হল। সুখিপল্লী তার ঘরছাড়া মনকে বেঁধে রাখতে পারল না। যাত্রাভিনয়ে তার যথেষ্ট ধনসঞ্চয়ও হয়েছিল। সম্মুখে প্রসারিত সুদীর্ঘ রাজপথ যেন তাকে অঙ্গুলিসংকেতে ডাকতে লাগল দূর দিগ্‌বলয় রেখার দিকে। একদিন রাত্রে আকাশে চন্দ্র যখন তার নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছে অসীমের পথে, মধুকরও আবার ঘর ছেড়ে

Digitized by srujan ka@gmail.com

বেরিয়ে পড়ল। ভাবল এবার সে তক্ষশিলা *বিহারে গিয়ে বিদ্যাভ্যাস করবে।

অবশেষে তক্ষশিলায় মন বসিয়ে সে ছিল তিন বৎসর কাল। কিন্তু সে তুলনায় তার বিদ্যার্জন হল যৎসামান্য। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যায়ী সে প্রায়শঃ কালহরণ করত কাব্যনাটকাদি পাঠে। সঙ্গে যে অর্থ ছিল তা শৌণ্ডিকগৃহে ও অষ্টাপদ ক্রীড়ায় ব্যয়িত হয়ে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হল। পক্ষান্তরে তার জীবনের সমস্ত প্রকার সুখভোগের ইচ্ছা ক্ষীণ হল না। তার সুরসিক বাক্‌ভঙ্গি, সুমধুর কণ্ঠ ও পরিশীলিত ব্যবহারে সে নগরবাসীদের প্রিয় হয়েছিল, যাত্রার দলে দুই বৎসর সে বৃথা যাপন করে নি, সেখানে সে স্বয়ং নাটক ও কাব্য রচনার প্রেরণা পেয়েছিল। আপন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে সে নাটক রচনা করতে লাগল। রসিক মন্ডলীর কাছে সে সকল আদৃত হ'ল। তক্ষশিলায় বিদ্যার্জন যাই হোক এই সমাদরই মধুকরের বিশেষ লাভ হল। কিন্তু এই কারণেই তাকে একদিন তক্ষশিলা ত্যাগ করতে হ'ল।

সে সময়ে উত্তরাখণ্ডের অধিবাসীরা অতিরিক্ত রাজকরের ভারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। নানাবিধ রাজকর দেবার পরে আপন ভরণ পোষণের জন্য তাদের সামান্যই অবশিষ্ট থাকছিল। সর্বাগ্রে দেয় ছিল 'ভাগ', অর্থাৎ উৎপাদকের ষষ্ঠ ভাগ। উপরন্তু কর এবং শুল্ক। রাজার পুত্র বা কন্যার বিবাহে দিতে হত 'প্রণয়' অর্থাৎ অবশ্যদেয় প্রীতি-উপহার অথবা অর্থ। তদুপরি ছিল 'বলী', অর্থাৎ কোনও বৃহৎ কার্যে অর্থ সাহায্য, তাও অবশ্যদেয়। এই সকলের উপর প্রজাগণকে 'বিষ্টি' করতে অর্থাৎ বেগার খাটতে বাধ্য করা হল। রাজা একটি বিশাল রাজপুরী নির্মাণে প্রজাগণকে বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদানের আজ্ঞা করলেন। তখন প্রজাগণের মধ্যে বিদ্রোহের গুপ্ত মন্ত্রণা আরম্ভ হল। এই সময়ে মধুকর এই ব্যাপার অবলম্বনে একটি বিদ্রূপাত্মক নাটক রচনা করল। তা অভিনীত হল ও স্বভাবতঃই জনপ্রিয়ও হল। ফলে মধুকর রাজরোষে পতিত হয়ে উত্তরাখণ্ড থেকে নির্বাসিত হল।

তক্ষশিলা ত্যাগ করে মধুকর ভোজ রাজ্যে আশ্রয় নিল। দেখল সে দেশের লোক ভোজবিদ্যায় নিপুণ। সে তাদের কাছে ভোজবিদ্যা শিক্ষা করতে লাগল। কিছুকালের মধ্যে সে সেই বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ভোজবাজি দেখিয়ে রীতিমত অর্থোপার্জন করতে লাগল। বাজিকর বেশে ভ্রমণ করতে করতে সে ভোজক থেকে ক্রমে কর্ণাট রাজ্যে উপনীত হল।

কিছুকাল পরে একদিন মধুকর দরিদ্রের বেশে সঙ্গে এক রমণী নিয়ে কর্ণাট রাজ সাতকর্ণির রাজসভায় গিয়ে সভায় জাদু প্রদর্শনের জন্য রাজানুমতি ভিক্ষা করল। তার নানা জাদু ক্রীড়ায় সভাস্থ সকলে মুগ্ধ হ'ল। যখন তার ক্রীড়া প্রদর্শন প্রায়

---

* প্রাচীন নগরী, অধুনা পাকিস্তানে পশ্চিম-পাঞ্জাবের অন্তর্গত।

Digitized by srujan ka@gmail.com

সমাপ্ত তখন হঠাৎ যেন বহুদূরাগত দামামারোল শোনা গেল। দর্শকবৃন্দ এতক্ষণ নানা বিস্ময়ের পর এই নূতন বিস্ময়ে কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়ে ইতস্ততঃ চাইতে লাগল।

তার কারণ ছিল। কিছুদিন যাবৎ লোকমুখে শোনা যাচ্ছিল যে কলিঙ্গরাজ খারবেল তাঁর বিজয় অভিযান আরম্ভ করেছেন। এখন সকলের ধারণা হল তাহলে বোধ হয় স্বয়ং খারবেল এসে কর্ণাট আক্রমণ করেছেন। জাদুকর মধুকর কান পেতে সেই দামামার শব্দ শুনে বললে,—মহারাজ, এ মর্ত্যের কোনো যুদ্ধের ভেরিনিনাদ নয়। এ যুদ্ধ লেগেছে অন্তরীক্ষে, দেব ও দানব দলের মধ্যে। দানব সৈন্যদলে আমার এমন এক বন্ধু আছেন যিনি এক সময়ে আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন, তাই তাঁর বিপদে সাহায্য করতে আমি সত্যবদ্ধ হয়েছিলেন। আজ আমাকে সেই সত্যরক্ষা করতে যেতে হবে, আমি চললাম। মহারাজ আমায় বিদায় দিন। আমার স্ত্রীকে আমি মহারাজের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে রেখে দিয়ে যাচ্ছি। আমি ফিরে এসে তাকে মহারাজের নিকট হতে নিয়ে যাব।

মহারাজ সম্মতি দিলেন। তখন মধুকর তার জাদু-পেটিকা থেকে এক অতি দীর্ঘ রজ্জু বার করে ঊর্ধ্বে নিক্ষেপ করল। রজ্জুর অগ্রভাগ দেখতে দেখতে বহু ঊর্ধ্বে উঠে শূন্যে দৃষ্টির অগোচর হল, কিন্তু সমস্ত রজ্জুটি সটান সোজা হয়ে রইল। তখন মধুকর রাজা ও সভাস্থ সকলকে প্রণাম করে এবং তথাকথিত স্ত্রীর নিকট বিদায় নিয়ে সেই দড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। দূর আকাশের ভেরি নির্ঘোষ যেন স্পষ্টতর হল। সকলে অবাক হয়ে দেখলেন জাদুকর ক্রমে অসীম আকাশে বিলীন হল।

এবার ভেরির সঙ্গে তুরী শঙ্খ প্রভৃতির শব্দও শোনা যেতে লাগল। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে ভাবলেন দেবদানবগণ যুদ্ধ করতে করতে বুঝি মর্ত্যেই নেমে আসছেন। যে যার আসনে স্থাণুবৎ নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে থাকতে এক সময়ে হঠাৎ ভয়বিহ্বল নয়নে দেখলেন একখানি রক্তাক্ত ছিন্ন পাদ সভাস্থলে এসে পড়ল! ক্রমে আর একটি পাদ, দুইখানি হস্ত প্রভৃতি একে একে পড়ল।

মধুকরের সঙ্গিনী শোনিতলিপ্ত একখানি পাদ তুলে ধরে নিরীক্ষণ করে বলল,—এ আমার স্বামীর পদযুগলের এক। বলে সে ক্রন্দনরতা হল। সভাস্থ সকলে রমণীকে আশ্বাসনা দেবার প্রয়াস পেলেন, কিন্তু রমণী চোখ মুছতে মুছতে বলল, আমার জীবনে আর কি প্রয়োজন? মহারাজ চিতা প্রস্তুত করতে আজ্ঞা করুন, আমি চুল্লিতে জীবন বিসর্জন দেব। সকলে তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলে সে করজোড়ে বলল, —আপনারা আমার নারীধর্মে বাধা দেবেন না, তাতে আপনাদের পাপ হবে। মহারাজ, আপনার নিকট ভিক্ষা আমার নারীধর্ম রক্ষা করুন।

মহারাজ সাতকর্ণি অগত্যা চিতা প্রস্তুত করালেন। চিতায় অগ্নিসংযোগ হলে রমণী

Digitized by srujan ka@gmail.com

চিতা প্রদক্ষিণ করে অতঃপর তাতে প্রবেশ করল এবং অল্পকালের মধ্যে ভস্মীভূত হয়ে গেল।

এর কিয়ৎকাল পরেই সকলে অতীব আশ্চর্যান্বিত হয়ে দেখল জাদুকর সেই রজ্জু বেয়ে নেমে আসছে, উপরন্তু তার পরিধানে এখন রাজকীয় বেশ! অবতরণান্তে সে দেবদানব যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনা দিতে লাগল। অবশেষে সে বলল,—দানবপক্ষের জয় হয়েছে, আমার ঐশ্বর্যশালী বন্ধু আমার সহায়তায় প্রীত হয়ে আমায় এই বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও মুক্তামালা উপহার দিয়েছে। মহারাজ, আর কোনও ভয়ের কারণ নাই, এবার আমার ভার্যাকে আমার হাতে প্রত্যর্পণ করুন।

মহারাজ আগে থেকেই ঘোর চিন্তিত হয়েছিলেন, এখন মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। মহামন্ত্রী তখন সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক প্রকাশ ক'রে এই অলোকশ্রুত মায়াবীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে বললেন,—হে ভোজবিদ্, সে অবস্থায় আমাদের কোনও উপায় ছিল না।

মায়াবী মধুকর এই বৃত্তান্ত শুনে বিলাপ করতে করতে বলল,—মহারাজ, আপনি শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না, অবিবেচকের ন্যায় কাজ করলেন। যাই হোক, আপনার রাজধর্ম আপনি বুঝবেন, আমি আমার ভার্যাকে ফিরে পাবার চেষ্টায় আজ আমার মায়া বিদ্যার প্রান্তিক প্রয়োগ করব, যদিও বা তা আমার প্রাণান্তিকও হতে পারে। তবে, ভার্যা বিনা আমার জীবনই বা কি প্রয়োজন!

এই বলে মধুকর নির্বাপিত চিতা বিপরীত-প্রদক্ষিণ ক'রে তার সঙ্গিনীর নাম ধরে ডাকতে লাগল। তখন সেই রমণী ধীরে চিতার ভেতর থেকে সশরীরে উঠে এল তারও পরিধানে তখন মহার্ঘ বসন। সভায় ধন্য ধন্য পড়ে গেল। উভয়ে মহারাজকে প্রণাম করে গুরু-অঙ্ক পারিতোষিক নিয়ে প্রস্থান করল। ক্ষণেক পরে দূরে তাদের অপস্রিয়মান মূর্তি দেখা গেল—পূর্ববৎ দরিদ্রবেশে! তখন সকলের নিশ্চিত হৃদয়ঙ্গম হল সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী সমস্তই অলীক, কেবল জাদুবিদ্যার কুহকমায়া, প্রকৃত ইন্দ্রজাল।

অতঃপর মধুকর মহাসুখে কর্ণাট দেশে বাস করতে লাগল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার চিত্ত পুনরায় পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত চঞ্চল হয়ে উঠল, মুক্ত আকাশ আবার তাকে ডাকতে লাগল। ভাগ্যক্রমে কর্ণাটে বাসকালে পেরিপ্লাস নামে এক মিসর দেশবাসী গ্রীক নাবিক-বণিকের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। দুই জনের মনোবৃত্তি একই প্রকার। মধুকরের যেমন পথের নেশা পেরিপ্লাসের তেমনই সমুদ্রের। পেরিপ্লাস যেদিন তার নিজস্ব অর্ণবপোতে সুবর্ণ দ্বীপ যাত্রা করল সেদিন মধুকরেরও সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হ'ল জীবনে প্রথম সমুদ্রযাত্রার। এর মাদকতা তাকে অভিভূত করল। স্থলপথের আহ্বান যতই মধুর অনির্দেশ্য হোক সে নিজে স্থির, জলপথ

Digitized by srujan ka@gmail.com

চিরচঞ্চল—মধুকরের মনের মতই। কিন্তু প্রথম যাত্রার কারণেই সেই চিরচঞ্চল পথের সদা আন্দোলনে সে বার বার অসুস্থ, শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। তবে অচিরেই আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উৎফুল্ল চিত্তে সুবর্ণ দ্বীপ জম্বুদ্বীপ (কাম্বোডিআ) প্রভৃতি নানা দেশে প্রায় আট বৎসর কাল ভ্রমণ করে পেরিপ্লাসের সঙ্গেই ফিরে এল। তদবধি সে আবার সুখিপল্লীতেই। ভোজবিদ্যার কল্যাণে সে যেমন ধনোপার্জন করেছিল তার ব্যয়শৌণ্ড স্বভাবের জন্য প্রায় সবই ভোজবাজির মত উড়েও গিয়েছিল।

এই সময়েই চম্পার মা তাকে আপন গৃহে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। কিশোরী চম্পার করুণ সৌন্দর্য মধুকরের মনে যে অননুভূতপূর্ব বাৎসল্যের সঞ্চার করল তাই বুঝি অবশেষে তাকে এই গৃহে বেঁধে রাখল। মধুকর দেখল তার ভ্রাতুষ্পুত্রী বুদ্ধিমতী, সে সানন্দে তাকে নানা বিষয় শিক্ষা দিতে লাগল, পাঠ দিতে লাগল তার দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার গ্রন্থ থেকে। কখনো বা স্বকৃত নাটক বা কাব্য পাঠ করে তাকে শোনাতে লাগল। দেখল চম্পার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ, সবই তার কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। সেগুলি আবার চম্পার মুখ থেকে শুনে মধুকর এক বিচিত্র আনন্দ অনুভব করতে লাগল। এইরূপে দারিদ্র্য সত্ত্বেও সুখেই মধুকরের দিন কাটতে লাগল।

কিন্তু সদ্য যৌবনাগমে চম্পা যেদিন অকস্মাৎ তার চলৎশক্তি হারিয়ে শয্যা আশ্রয় করল সেদিন মধুকর অচিন্ত্যপূর্ব আঘাতে মর্মাহত হয়ে পড়ল। তার কোনও নাটকে মানুষের এমন দুঃখ এমন ক্লেশের কল্পনা সে কখনও করেনি। তার মনে হল তার মনের স্বাভাবিক আনন্দ তাকে চিরতরে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু ক্রমে সে তা ফিরে পেল এবং সেই অবধি তার একমাত্র চিন্তা হ'ল চম্পাকে কি করে সুখী করা যায়। চম্পার শয্যাপার্শ্বে বসে চম্পার প্রিয় মধুকাকা তার স্বাভাবিক সুকণ্ঠে গান ক'রে, কখনো বা নাটকাদি পাঠ ক'রে তার আদরের চম্পাকে যথাসম্ভব প্রফুল্লচিত্ত রাখার চেষ্টা করত। কিন্তু সে নাটকস্থ প্রেমের দৃশ্য পাঠ বা প্রেমসঙ্গীত গান করার সময়ে চম্পা ক্রন্দনবেগ সংবরণ করতে পারত না। বার বার তাই দেখে কি ভেবে মধুকর নাটকপাঠ স্থগিত রাখল। পরিবর্তে দেশবিদেশে তার নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী শুনিয়ে সে চম্পাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করতে লাগল। ক্রমে চম্পা আসাযষ্টি অবলম্বনে গমনাগমনে অভ্যস্তা হ'ল।

॥ ৪ ॥

চম্পা বহুক্ষণ যাবৎ নিদ্রা গেল। তার মা এসে দ্বার খুলতে সেই শব্দে সে চমকে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল,—মা, মধুকাকা কোথায়?

—কি জানি, হয়তো শৌণ্ডিকগৃহে, ঠিক ভোজনের সময়ে এসে উপস্থিত হবে! এই বলে মা রাত্রিভোজনের ব্যবস্থা করতে গেল।

Digitized by srujan ka@gmail.com

চম্পা আসা দুখানিতে ভর করে আস্তে আস্তে এসে মার কাছে দাঁড়াল। বলল,—মা, আমি আজ স্বয়ং ভগবানকে দেখেছি।

—ভাল করেছিস্, মা। যা তো, উননটা একটু জ্বেলে দে। তোর মধুকাকা হয়তো এখনই ক্ষুধায় অস্থির হয়ে এসে পড়বে।

চম্পা সে কথায় কর্ণপাত না ক'রে বলল,—মা, আমার কথা একটু শোন। আমি সত্যি বলছি আমি স্বয়ং ভগবানকে দেখেছি। কেবল দেখিনি, তাঁর সঙ্গে কথা কয়েছি, তিনি এসে আমার কোলে বসেছিলেন।

মা হেসে বলল,—আমি যখন এলাম তখন তো তুই অঘোরে ঘুমাচ্ছিলি—স্বপ্ন দেখছিলি বোধ হয়। তবু, ভগবানকে স্বপ্নে দেখাও তো বহু ভাগ্যের কথা। যা, উনানটা জ্বেলে দে—আমি ভারী ক্লান্ত।

চম্পা অস্থির হয়ে বলল,—না মা, স্বপ্ন নয়, আমি তাঁকে সশরীরে দেখেছি—এখানে নয়, ভাঙ্গা মন্দিরে।

এই বলে চম্পা আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। মা প্রথমে মহা আশ্চর্য বোধ করল, তারপর চিন্তিত হয়ে অধোদৃষ্টিতে ব'সে রইল। চম্পা এত বর্ণনা দিয়েছে যে তা স্বপ্ন ব'লে অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না, অথচ সত্য ব'লে মেনে নেওয়াও তো যায় না।

অবশেষে মা বলল,—তোর কথা স্বপ্ন হোক বা সত্য হোক আজ যাঁরা এলেন—যাঁদের জন্য উৎসব—সেই দুই ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ যে সোমদত্ত পুত্র মহাকাঞ্চন তিনি যে মহা ধার্মিক তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শুনেছি তিনি মস্ত যোগীও বটেন। তিনি আদেশ করলে তোর পা হয়তো ভাল হয়ে যেতেও পারে। এমন অনেক ঘটেছে বলে আমি শুনেছি।

উৎসাহ পেয়ে চম্পা বলল,—হাঁ মা, শুনেছি মধুকাকা তাঁর ভারী বন্ধু, কোথায় নাকি দু'জনে এক সঙ্গে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। মধুকাকাকে বললে আমায় তাঁর কাছে নিয়ে যাবে না?

মা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বলল,—থাম্, আমায় ভাবতে দে। তুই কিন্তু মধুকে নিজেই বলতে যাস্ না। কাউকেই এ কথা কিছু বলিস্ না। মধু খেয়ে দেয়ে একটু সুস্থ হ'লে আমি সুবিধা মত তাকে বলব এখন। যা তো, উননটা ধরিয়ে দে।

মা বড়ই আনমনা হয়ে রইল। সংসারে সে বহু দুঃখ কষ্ট সয়েছে, স্বামীকে হারাব পর থেকে নানা বিপদ আপদের মধ্য দিয়ে তাকে চলে আসতে হয়েছে, যত বড় বিপদই হোক কখনও মনোবল হারায়নি, শান্ত সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু এখন এ তো বিপদ নয়, এ যে এক অচিন্তনীয় পরিস্থিতি, এ তার বুদ্ধিতে কুলিয়ে উঠছে না। একবার ভাবল পায়ের দোষের জন্য চম্পার বিবাহ হচ্ছে না

Digitized by srujan ka@gmail.com

ব'লে তার মতিভ্রম হয়েছে। আবার ভাবল হয়তো সমস্তই সত্য। এমনি নানা সংশয়-সন্দেহের মধ্যে চম্পার মা বুদ্ধিমান দেবরের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগল।

কিয়ৎক্ষণ পরে স্বকৃত নাটকের অংশবিশেষ আবৃত্তি করতে করতে এবং বারুণী প্রসাদে স্খলিত গতিতে মধুকর গৃহে এসে উপস্থিত হ'ল। তিনজনে মিলে আহারে বসলে সে মহা উৎসাহে উৎসবের গল্প করতে করতে মহাকাঞ্চন ও মহাশাল সম্বন্ধে নানা কথা বলল।

॥ ৫ ॥

সোমদত্ত সুখিপল্লীর এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি অতিশয় পণ্ডিত ও জ্ঞানী। উপরন্তু সোমদত্ত নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী। তাঁর পত্নী কাত্যায়নী তিনটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন; মহাকাঞ্চন, মহাশাল ও মহাসার। ভারতে তখন বৌদ্ধধর্মই প্রচলিত হলেও তিনি কিন্তু সে ধর্মকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন। যে ধর্ম বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে না, ব্রাহ্মণক তার ন্যায্য সম্মান দেয় না, সে ধর্ম তাঁর বিবেচনায় অতি নিকৃষ্ট ও সর্বদা বর্জনীয়। বৌদ্ধরাজ্যের সুখিপল্লীর অধিবাসীরা বৌদ্ধ বটে, কিন্তু সোমদত্ত ও আর কেউ কেউ সে ধর্ম গ্রহণ করেননি।

সোমদত্তের জ্যেষ্ঠপুত্র মহাকাঞ্চন বাল্যাবধি অসাধারণ মেধাবী, নিষ্ঠাবান ও ধার্মিক। সেও পিতার মত বাল্যাবধি বৌদ্ধধর্মের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ ক'রে এসেছে।

পিতার নিকট মহাকালের সমস্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন যখন সমাপ্ত হ'ল তখন তার বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম। মহর্ষি পতঞ্জলির যোগদর্শনের কথা শুনে পিতার অনুমতি নিয়ে মহাকাঞ্চন একদিন পতঞ্জলির আশ্রমে যোগশিক্ষার্থ মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। নগরীর উপকণ্ঠে এই আশ্রম। মধুকর মহাকাঞ্চনের আবাল্য সঙ্গী, কিন্তু সে মহাকাঞ্চনকে তার এই সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করতে বহু চেষ্টা করেছিল, তবু মহাকাঞ্চন তার সংকল্পে অটল রইল দেখে অবশেষে সে নিজেও মহাকাঞ্চনের সঙ্গে পাটলিপুত্র যাত্রা করল।

মহর্ষি পতঞ্জলি মহাকাঞ্চনের দীর্ঘ সুঠাম আকৃতি ও সৌম্য তোজোদীপ্ত মুখশ্রী দেখে নির্দ্বিধায় তাকে আপন শিষ্যত্বে বরণ করলেন এবং তার অনুরোধে মধুকরকেও শিষ্যত্বে গ্রহণ করলেন। অতঃপর কিছুদিন পরে মধুকর কি ভাবে আশ্রম থেকে বিদায় নিল তা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

মহাকাঞ্চনের অভিনিবেশ বা মনঃসংযোগের শক্তি অসাধারণ। তার সংকল্পও পর্বতসদৃশ অটল, তার দৃষ্টান্ত পরে আমরা আরো দেখতে পাব। সে অহিংসা, সত্যনিষ্ঠা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ এই পঞ্চ যম অভ্যাস করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিতি-অপ-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোম দ্বারা বাহ্যক শৌচ ও ভাবশুদ্ধি দ্বারা অন্তঃশৌচ, সন্তোষ,

Digitized by srujan ka@gmail.com

তপস্যা, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরচিন্তা এই পঞ্চ নিয়ম পালন করতে লাগল। এতদ্‌ব্যতীত মহাকাঞ্চন প্রতিপক্ষ, ভাবনা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা দ্বারা চিত্তসংযম অভ্যাস করল।

একদিন মহাকাঞ্চন ব্রাহ্ম মুহূর্তে গুরুদেবের সহিত অবগাহন করতে যাবার কালে শৌচক্রিয়ার জন্য বনে প্রবেশ করা মাত্র এক ব্যাঘ্র তার দিকে ধাবিত হল। মহাকাঞ্চন স্থিরভাবেই অবস্থান করল। ব্যাঘ্র নিকটে এসে তাকে প্রদক্ষিণপূর্বক আঘ্রাণ ক'রে চ'লে গেল। মহর্ষি পতঞ্জলির তা দৃষ্টিগোচর হয়েছিল।

মহাকাঞ্চন ফিরে আসতে মহর্ষি তাকে বললেন,—বৎস, যোগাভ্যাসের প্রথম প্রকরণ যম, যমের প্রথম সোপান অহিংসা। তাতে তুমি সিদ্ধ হয়েছে, তাই হিংস্র জন্তুও তোমায় হিংসা করছে না। এতে তুমি আনন্দিত বা বিস্মিত হয়ো না। প্রকৃত পক্ষে যম ও নিয়ম এই দুইটি প্রকরণেই তোমার সিদ্ধিলাভ হয়ে গেছে। এবার তুমি আসন আরম্ভ কর। প্রথমে স্থির সুখাসন। শরীর ও মন অবিকম্পিত রেখে এবং কোনও প্রকার আয়াস বা কষ্ট শরীরকে না দিয়ে উপবেশনের নাম সুখাসন।

অল্পকাল মধ্যেই মহাকাঞ্চনের আসন সিদ্ধি হ'ল। শীতগ্রীষ্মাদি দ্বারা তার শরীর আর আহত হল না। মহর্ষি তখন তাকে প্রাণায়াম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। আসনে উপবিষ্ট হয়ে মহাকাঞ্চন শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিচ্ছিন্ন করা অভ্যাস করতে লাগল। প্রথমে দণ্ড কাল, তারপর এক দিন, ক্রমে এক মাস ও শেষে বর্ষৈক পর্যন্ত মহাকাঞ্চন নিয়তশ্বাস হয়ে থাকতে সমর্থ হ'ল।

একদা মহকাঞ্চন আসনস্থ হয়ে প্রাণায়ামরত অবস্থায় এক অপূর্ব জ্যোতিঃ দেখতে পেল। তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'ল। অপার আনন্দ ও বিস্ময়ে সে সেই জ্যোতিতে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে রইল। শরীরে যেন শত সিংহের বল অনুভব করল। এত দিনে তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে ভেবে সে পুলকিত হ'ল।

এই সময়ে পতঞ্জলি উপস্থিত হয়ে বললেন,—বৎস, যোগের এক একটি প্রকরণে সিদ্ধিলাভের সময়ে যে সকল ফললাভ হয় সেগুলিকে উপসর্গ বা উপদ্রব মাত্র ব'লে জানবে। বাস্তবিক যোগের পরাকাষ্ঠা যে সমাধি এগুলি তার শত্রু। অতএব যোগের এই সব অন্তর্বর্তী সামান্য ফললাভে বিস্মিত বা পুলকিত হওয়া কিংবা সেগুলিকে স্বীকার ক'রে তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া কৈবল্যকামী যোগীর কর্তব্য নয়। তোমার প্রাণায়াম এতদবধি উত্তমরূপে সিদ্ধ হয়নি। অন্ত্য প্রকরণ সমাধি এখনও বহুদূরে। প্রাণায়ামেয় পরে প্রত্যাহার, তার পরে ধারণা, তার পরে ধ্যান, তারও পরে সমাধি। সমাধিও ছয় প্রকার—সবিতর্ক, নির্বিতক, অবিচার, নির্বিচার, আনন্দ ও অস্মিত। তুমি এখনই আনন্দে অধীর হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। যোগের লক্ষ্য চিত্তবৃত্তির লোপসাধনপূর্বক প্রজ্ঞা দ্বারা সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি ক'রে আত্মার সহিত

Digitized by srujan ka@gmail.com

মিলিত হওয়া। বিভূতি এর এক পন্থামাত্র, লক্ষ্য নয়।

মহাকাঞ্চন কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। তার মন হঠযোগের প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। হঠযোগের দ্বারা দৈবশক্তি লাভ করে সে বৌদ্ধধর্মের বিলোপ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে এই হঠকারী চিন্তায় সে ব্যগ্র হয়ে পড়ল। বেদনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ্য ধর্মই একমাত্র ধর্ম এই ছিল তার ঐকান্তিক বিশ্বাস, বেদপ্রদর্শিত পন্থাই একমাত্র পন্থা, বেদপ্রতিপাদিত সত্যই একমাত্র সত্য, জগতের কল্যাণ কেবল বেদের দ্বারাই সাধিত হবে, অন্য ধর্ম জগতের পক্ষে অকল্যাণকর—এই ছিল তার দৃঢ় ধারণা।

প্রিয় শিষ্যের এই পরিবর্তন দেখে মহর্ষি পতঞ্জলি ব্যথিত হলেন। মহাকাঞ্চন এর পর আশ্রম ত্যাগ ক'রে নিকটস্থ পাটলিপুত্র নগরীর উদ্দেশে চ'লে গেল। তার পর এ যাবৎ আট বৎসর কেটে গেছে।

*   *   *   *

মহাকাঞ্চন যখন পতঞ্জলির আশ্রম ত্যাগ করে পাটলিপুত্রে গেল সে সময়ে মৌর্য বংশের শেষ রাজা অশোকের প্রপৌত্র বৃহদ্রথ রাজত্ব করছিলেন। বৃহদ্রথ বৌদ্ধ। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম তখন শোচনীয় আকার ধারণ করেছিল। বৃহদ্রথ স্বয়ং সুরাপান ও ভিক্ষুণীদের সঙ্গে বিকারগ্রস্ত কদাচরণে কালাতিপাত করছিলেন। মহাকাঞ্চন পাটলিপুত্রে এসে প্রথমে এই সকল সংবাদ সংগ্রহ করল।

একদিন প্রাতে মহাকাঞ্চন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছে এমন সময়ে বৃহদ্রথের ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র তার নিকটে স্নান করতে নামল। উভয়ে পরস্পরের অপরিচিত। মহাকাঞ্চন স্নানান্তে তীরে উঠবার সময়ে পুষ্যমিত্রের পাদসঞ্চালিত জল দৈবাৎ তার উপরে পড়ল। মহাকাঞ্চন জানে মগধ রাজ্যে প্রায় সকলেই বৌদ্ধ, সে রুষ্ট হয়ে ব'লে উঠল,—রে রে বৌদ্ধ নাস্তিক, তুই ব্রাহ্মণের অসম্মান করিস্! সাবধান!

পুষ্যমিত্র অবজ্ঞাভরে হেসে বলল,—মহাশয়, আমি বৌদ্ধ নই, নাস্তিকও নই, আমি ব্রাহ্মণ। অতএব আপনিও সাবধান হোন। বোধ হয় আপনি নবাগত, আমার পরিচয় অবগত নন। আমি মগধসেনাপতি পুষ্যমিত্র।

এদিকে মহাকাঞ্চন কি ক'রে পুষ্যমিত্রের সাক্ষাৎ লাভ করা যায় মনে মনে সেই কথাই চিন্তা করছিল, এখন তার সঙ্গেই সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে গেল। অল্পক্ষণ তার দিকে তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মহাকাঞ্চন বলল,—বৎস, তুমি আর ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দিও না। তুমি যদি ব্রাহ্মণ হ'তে তবে মগধে একটিও বৌদ্ধ থাকত না। যাই হোক, আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে তুমি নগরীর পুর্বোপকণ্ঠে আমার আশ্রমে এসো, বিশেষ বার্তা আছে। এই ব'লে মহাকাঞ্চন আপন আশ্রমে ফিরে এল।

সেনাপতি পুষ্যমিত্র দিনব্যাপী নানা রাজকার্যে ব্যাপৃত থেকে এই সামান্য ঘটনার

Digitized by srujan ka@gmail.com

কথা বিস্মৃত হ'ল। কিন্তু সন্ধ্যায় নিজ ভবনে প্রত্যাগমনকালে সিংহদ্বারে যেন মুহূর্তের জন্য সেই দীর্ঘকায় সুঠাম ব্রাহ্মণের তেজোদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখতে পেল। কিন্তু আপন গৃহে গমনান্তর আবার সে কথা ভুলে গেল। কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহর নিকট হলে তার মনে হতে লাগল যেন কেউ প্রাসাদের বাহির থেকে তাকে এক দুর্বোধ্য অজ্ঞাত আকর্ষণে প্রভাবিত করছে। অবশেষে সেই প্রভাববলে সে ক্রমশঃ মহাকাঞ্চনের আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

আশ্রমের ভিতরে বহুক্ষণ পর্যন্ত দুই জনের মধ্যে কি গুপ্ত মন্ত্রণা হ'ল তা জানা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। মন্ত্রণান্তে পুষ্যমিত্রকে বিদায় দিতে আশ্রমের বাহিরে গিয়ে মহাকাঞ্চন বলল,—বৎস, মহাত্মা পাণিনিকে কেবল ব্যাকরণ-স্রষ্টা পণ্ডিত মনে করো না, সেই মহাপ্রাজ্ঞের প্রত্যেকটি ব্যাকরণসূত্রের মধ্যে গূঢ় অর্থ নিহিত আছে। তাঁর 'নিপাতনে সিদ্ধিঃ', সূত্রটিকে নিরন্তর স্মরণ ক'রো।

এক সপ্তাহ পরে একদিন সেনাপতি পুষ্যমিত্র মহারাজ বৃহদ্রথকে নিবেদন জানিয়ে বলল,—মহারাজ, গুপ্তচরের নিকট সংবাদ পেয়েছি কলিঙ্গাধিপতি খারবেল মগধ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, যে কোনও মুহূর্তেই কলিঙ্গের দুর্ধর্ষ সেনা পাটলিপুত্রের দ্বারে এসে হানা দিতে পারে। ওদিকে উত্তর হতেও যবনরাজ দত্তমিত্র* মগধ আক্রমণ করার কথা ভাবছেন এমন সংবাদ আছে। দত্তমিত্রের সেনা গ্রীসীয় পদ্ধতিকে শিক্ষিত, তবে তাদের ভয় করবার কিছু নেই, কলিঙ্গাধিপতি খারবেল কর্ণাটরাজ সাতকর্ণিকে পরাজিত করে রাষ্ট্রিক ও ভোজকদের পদানত ক'রে দাক্ষিণাত্যের মূষিকদের নগরে ভীতি উৎপাদন ক'রে এখন উত্তরভারত জয়ের অভিপ্রায়ে রণসজ্জা করছেন। খারবেল প্রবল পরাক্রমী। অতএব মহারাজ, ত্বরিতে মগধসেনা প্রস্তুত ও তাদের উৎসাহিত করা আবশ্যক। উৎসাহদান নিমিত্ত দেবপাদ মহারাজ কল্য প্রাতঃকালে সৈন্যসমাবেশ পর্যবেক্ষণার্থ সমাবেশস্থলে বিরাজ করবেন এই নিবেদন।

উত্তর দক্ষিণ উভয়তঃ রাজ্য আক্রমণ সম্ভাবনা, তদুপরি খারবেলের নাম শুনে ভীত বৃহদ্রথ তৎক্ষণাৎ সেনাপতির প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। তাঁর ব্যসনলিপ্ত কোমল জীবন যাপনে তাঁর সেনাদলের সঙ্গে পরিচিত হবার অবসর হয়নি। মগধসেনা কেবল তাদের সেনাপতি পুষ্যমিত্রকেই জানে, তারা তাঁরই অনুগত।

পরদিন সকালে বৃহদ্রথ মহা সমারোহে সেনা পরিদর্শনে এলেন। অনতিদূরে কুতূহলী নগরবাসিগণের মধ্যে মহাকাঞ্চনও উপস্থিত ছিল, তবে তার কৌতূহল বুঝি কিঞ্চিৎ অন্য প্রকারের। তাই বুঝি তার দুই অস্বাভাবিক উদ্দীপ্ত চক্ষু অপলকে বৃহদ্রথ ও পুষ্যমিত্রের গতিবিধি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিরীক্ষণরত।

---

*ইতিহাস বর্ণিত গ্রীক রাজা ডিমেট্রিয়স্ —মূল গ্রন্থকার

Digitized by srujan ka@gmail.com

মহারাজ বৃহদ্রথ যখন সেনাপরিদর্শনান্তে সেনাদল ও উপস্থিত জনতার 'জয় মহারাজ বৃহদ্রথের জয়' এই বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে আপন শিবিরের দিকে প্রত্যাবর্তনের উদ্‌যোগ করছেন তখনই মহাকাঞ্চন হস্তোত্তলন করে বুঝি কি সঙ্কেত দান করল। পরমুহূর্তেই পুষ্যমিত্রের শাণিত খড়্‌গে বৃহদ্রথের মুণ্ড স্কন্ধচ্যুত হয়ে যেন 'নিপাতনের সিদ্ধিঃ'র অমোঘ সূত্র ঘোষণা করল। সেনাগণ চিৎকার ক'রে উঠল 'জয় মহারাজ পুষ্যমিত্রের জয়'! দর্শকদলের মধ্য থেকে মহাকাঞ্চনও মহানন্দে সেই জয়ধ্বনিতে আপন কণ্ঠ মেলাল।

নগরবাসীরা চোখের সামনে অকস্মাৎ এই ভয়ঙ্কর রাজহত্যা ঘটতে দেখে স্তম্ভিত হ'ল। আবার তাদেরই মধ্যে থেকে একজনকে বারংবার 'পুষ্যমিত্রের জয়' বলে ধ্বনি দিতে দেখে ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তারাও একযোগে চিৎকার করে উঠল 'জয় রাজা পুষ্যমিত্রের জয়'। যারা দূরে ছিল ত্রস্তে পলায়ন করল।

অতঃপর মহাকাঞ্চন নগরবাসিগণের ভিতর থেকে অগ্রসর হয়ে ধীর, দৃঢ় পদক্ষেপে ঘটনাস্থলে এসে বৃহদ্রথের রক্ত নিয়ে পুষ্যমিত্রের কপালে রাজতিলক অঙ্কিত করে আশীর্বাদ করল।

তখন পুষ্যমিত্র নিজেকে মগধাধিপতি বলে ঘোষণা করল এবং মহাকাঞ্চনকে রাজগুরু ও মহামন্ত্রী পদে বরণ করে তার চরণ বন্দনা করল। মহাকাঞ্চন এক ক্ষুদ্র ভাষণে বেদের অক্ষয় ও চিরন্তন মাহাত্ম্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বলল, এই রাজহত্যার দ্বারা এক নূতন যুগের সূচনা হ'ল এবং সেই কারণে মহারাজ পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করবেন ব'লে ঘোষণা করল।

নগরবাসীরা বৌদ্ধ। পলায়ন না ক'রে যারা তখনও অপেক্ষা করছিল তারা এই যজ্ঞানুষ্ঠান ঘোষণার তাৎপর্য বুঝতে পারল না, কেবল মহাকাঞ্চনের অচঞ্চল শান্ত দৃঢ় ভাব দেখে কতক আশ্বস্ত হয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেল।

॥ ৬ ॥

পুষ্যমিত্র সিংহাসনে আরোহণ করে নিজেকে পুষ্যমিত্র সুঙ্গ রূপে ঘোষণা ক'রে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। কিন্তু স্থানে স্থানে বৌদ্ধ বিদ্রোহ দমন ও যবনরাজ দত্তমিত্রের মগধ আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত থাকার জন্য তখনই অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্ভব হ'ল না। অবশেষে তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন আরম্ভ হ'ল। পুরোহিতদের জন্য একাধিক প্রকাণ্ড পাত্রে ব্রহ্মাণ্ডান্ন পাক হ'তে লাগল। চার শত গাভী ও পুষ্যমিত্রের নামাঙ্কিত চার শত স্বর্ণমুদ্রা পুরোহিতগণের মধ্যে বিতরিত হ'ল। পুষ্যমিত্র বহুরত্নখচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে চার মহিষীর সঙ্গে যজ্ঞের আয়োজন পরিদর্শন

Digitized by srujan ka@gmail.com

করতে লাগলেন। প্রত্যেক মহিষীর সঙ্গে বহু পরিচারিকা তাঁদের অনুগমন করল। যৌল্লিক, গৌল্লিক, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহামুদ্রাধিকৃত, উপরিক, বৃহদুপরিক, মহামাত্য, রহস্যাধিকৃত প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, করণ, দিবিরপতি প্রভৃতি কর্মচারিগণ বিভিন্ন সময়ে মহারাজের অনুগমন করল। সন্ধ্যার পরে অগ্নিহোত্র নামক প্রাত্যহিক হোম সমাপনান্তে মহারাজ উত্তর দিকে মুখ করে গার্হপত্য অগ্নির নিকটে দ্বিতীয়া মহিষীর জানুদ্বয়ের মধবর্তী হয়ে উপবেশন করলেন এবং ব্রহ্মাচর্য পালন ক'রে সমস্ত রাত্রি যাপন করলেন।

পরদিন প্রভাতে একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব আনীত হ'ল। অশ্বের বল্‌গায় পুরোহিতগণের নিমিত্ত পক্ব ব্রহ্মাণ্ডান্নের প্রলেপ দিয়ে সেই বল্‌গা পরিয়ে অশ্বকে নির্মল পুষ্করিণীতে স্নান করিয়ে আনা হ'ল। তারপর জনৈক শূদ্র একটি চতুরক্ষ কুকুরকে সিদ্ধ্রক কাষ্ঠ দ্বারা হত্যা করে দণ্ডায়মান অশ্বের নীচে কুশাসনে রক্ষা করল। মহারাজ মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। স্নানান্তে অশ্বের দেহ শুষ্ক করবার জন্য তাকে অগ্নির নিকটে নিয়ে যাওয়া হ'ল, পুরোহিতগণ মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। অশ্বটি সম্পূর্ণ শুষ্ক হবার পর সবিতৃদেবের উদ্দেশে তিনবার পুরোডাশ নিক্ষেপ করা হ'ল, প্রত্যেক ক্ষেপে পুরোহিতগণকে শত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হ'ল। তৃতীয় ক্ষেপের পর অশ্বটিকে উত্তর-পূর্ব দিকে মুক্ত ক'রে দেওয়া হ'ল এবং তার সঙ্গে আরও এক শত অশ্ব ছেড়ে দেওয়া হ'ল। প্রধান অশ্বের রক্ষার নিমিত্ত তার সঙ্গে সৈন্যসামন্ত গেল। রাজগুরু মহাকাঞ্চনও তাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন।

তারপর যজ্ঞদেবী দক্ষিণ দিকে স্বর্ণ-সিংহাসনে মহারাজ আসীন হলেন। তাঁর সন্নিধানে হোতা, অধ্বর্যু ও উদ্‌গাতৃগণও উপবেশন করল। ভাটগণ প্রত্যহ পরিপ্লব গান করতে লাগল, গীত বাদ্য নৃত্যও হ'তে লাগল।

ওদিকে অশ্বমেধের অশ্ব এবং তার সঙ্গে রাজগুরু মহাকাঞ্চন একের পর এক নানা দেশ অতিক্রম করে যেতে লাগলেন, এই অবসরে তাঁর মধ্যম ভ্রাতা মহাশালের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় হওয়া আবশ্যক। মহাশাল মহাকাঞ্চনের দুই বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ। আজন্ম সে বিশালকায়, সেই হেতু পিতা সোমদত্ত তার নাম মহাশাল রেখেছিলেন। মহাকাঞ্চনের মত সেও মেধাবী, কিন্তু আবাল্য তার মন শাস্ত্র অপেক্ষা শস্ত্রর পক্ষপাতী। মাত্র আট বৎসর বয়সেই আপন চেষ্টায় সে সমস্ত প্রকার অস্ত্রচালনা শিখে নিল। কিন্তু তার শাস্ত্র শিক্ষার জন্য সোমদত্তের সমস্ত চেষ্টা বৃথা হ'ল।

বয়ঃক্রমের সঙ্গে সঙ্গে মহাশাল অতিশয় মৃগয়াপ্রিয় হয়ে উঠল। তাতে সে এমনই নিপুণ হ'ল যে পশুপক্ষীর শব্দমাত্র লক্ষ করে সে অব্যর্থ শরসন্ধানে সমর্থ হ'ল। তার দেহে শক্তি মনে সাহস যেমন অসাধারণ, আশা-আকাঙ্ক্ষাও তেমনই অসীম। সে একজন অগ্রগণ্য বীর হবে এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। তার এই ভাব সদৃশ সুযোগও

Digitized by srujan ka@gmail.com

একদিন উপস্থিত হ'ল।

তখন মহাশালের অষ্টাদশ বর্ষ মাত্র বয়স। মহারাজ খারবেল রাজধানী কলিঙ্গনগর থেকে বহুদূরে সুখিপল্লীর ঘন অরণ্যে মৃগয়া করতে এলেন। মহাশাল অধিকাংশ সময় অরণ্যে অতিবাহিত করত, সেদিনও সে বনে ভ্রমণ করছিল। এক সিংহ মহারাজ খারবেলের অজ্ঞাতসারে তাঁর অনুসরণ করে এক সময়ে হঠাৎ তাঁকে লক্ষ করে লম্ফ প্রদান করল। মহারাজ তাঁর কার্মুকে শরযোজনের সময় মাত্র পেলেন না। কিন্তু সিংহ শূন্যে থাকতেই কার দুইটি অব্যর্থ শর যুগপৎ এসে তার হৃদয় ভেদ করল। মহারাজ ক্ষিপ্রপদে এক পাশে স'রে গেলেন, মৃত সিংহ তাঁর পাশে এসে পড়ল। কে এই অদ্ভুতকর্মা শরসন্ধানী চিন্তা করতে করতে মহারাজ চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন অনতিদূরে এক শালপ্রাংশু গৌরকান্তি যুবা ধনুর্বাণ হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

খারবেল বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞসা করলেন,—কে তুমি, যুবক?

—আমি সুখিপল্লীর ব্রাহ্মণ সোমদত্তের মধ্যম পুত্র মহাশাল।

খারবেল তৎক্ষণাৎ তাঁর কোষমুক্ত অসি দ্বারা মহাশালের শিরঃস্পর্শ করে তাকে আপন দেহরক্ষী নিযুক্ত করে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। কিছুকালের মধ্যে ক্রমশঃ মহাশালের রণকৌশলের উপযুক্ত মেধার পরিচয় পেয়ে খারবেল তাকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করলেন। তখন কর্ণাট বিজয় এবং ভোজক ও রাষ্ট্রিকদের দমন প্রভৃতি অভিযানে মহাশাল অসাধারণ পরাক্রম ও রণকৌশলের পরিচয় দিল। কিন্তু তার এক মহৎ দোষ থেকে গেল, সে অতিগর্বী, নিজের সম্বন্ধে তার অতি উচ্চ ধারণা এবং তার ফলে কিঞ্চিৎ অবাধ্য। সেই হেতু খারবেল তাকে এক শতের অধিক সেনার সেনাপতি করলেন না।

এদিকে অশ্বমেধের অশ্ব ও তৎসমভিব্যাহারী সৈন্যসামন্ত মহাকাঞ্চনের অধীনে প্রায় এক বৎসর ধরে মহাকোশল অঙ্গ বঙ্গ অযোধ্যা প্রভৃতি দেশ নির্বিঘ্নে ভ্রমণ ক'রে অবশেষে কলিঙ্গ দেশের বৌদ্ধরাজ্যস্থ সুখিপল্লীর অরণ্যে এসে উপস্থিত হ'ল। মহাশাল তখন খারবেলের রাজপাদমূলিক পদে স্থিত। সে তার একশত সেনাসহ কলিঙ্গের উত্তর সীমান্ত পরিদর্শনে যাবার পথে পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধের অশ্ব, সহস্রাধিক সেনা ও আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাকাঞ্চনকে তাদের অগোচরে দেখতে পেল। সে দেখল মগধের রাজশক্তিকে বিড়ম্বিত করবার এ এক মহা সুযোগ উপস্থিত। সে তখন তার উত্তর সীমান্তের দিকে না গিয়ে এক সৈনিকের মুখে মহারাজ খারবেলকে পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের বার্তা পাঠিয়ে দিল এবং তারপর সসৈন্যে সুখিপল্লীর ঘন অরণ্যে আত্মগোপন ক'রে রইল। সে বিবেচনা করল যে মগধসেনা যখন দক্ষিণে যেতে চাইছে তখন তাকে এই ঘন অরণ্য পথেই যেতে হবে, কারণ আর কোনও

Digitized by srujan ka@gmail.com

পথ নেই বা থাকলেও অতি দীর্ঘ কিংবা পার্বত্য ও দুরতিক্রম্য। সে নিজের সৈন্যদের বিশ্রামের আদেশ দিল। তারা বরাহ শিকার ক'রে আনন্দে শূলপক্ক বরাহমাংস ভোজন করে বিশ্রাম করতে লাগল। সন্ধ্যা আগত হলে মহাশাল আদেশ দিল বৃক্ষে আরোহণ ক'রে সেইখানেই রাত্রি যাপন করতে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর সময়ে মগধসেনা অশ্বমেধের অশ্বসহ অরণ্যে এসে উপস্থিত হ'ল এবং রাত্রিবাসের জন্য সেইখানে শিবির স্থাপন করল। অশ্বগুলিকে বৃক্ষে বেঁধে দিয়ে তারা ভোজনান্তে শয়ন করল। পথশ্রান্ত মগধসেনা সেই দেশ অতি শান্তিপূর্ণ দেখে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হ'ল। কেবল একজন সৈনিক অশ্বমেধের অশ্বরক্ষার নিমিত্ত জেগে রইল। কিছুক্ষণ পরে মহাশাল নিঃশব্দে বৃক্ষ থেকে নেমে এসে লঘু পদক্ষেপে গিয়ে সেই জাগরূক সৈনিকের মুখ চেপে ধরল। তার বিশাল দৃঢ় হস্তের চাপে সৈনিক একটি শব্দও করতে পারল না, মহাশালও সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ ছুরিকা তার বক্ষে আমূল প্রোথিত করল। মৃত সৈনিককে ধীরে ভূতলে শুইয়ে দিয়ে মহাশাল তার সেনাদের অভ্যস্ত সঙ্কেত দিল। তারা নিমেষের মধ্যে সন্তর্পণে বৃক্ষ থেকে নেমে এসে সুপ্ত মগধসৈন্যকে ঘিরে ফেলল। মহাশাল দ্বিতীয় বার সঙ্কেত দেওয়া মাত্র সেই এক শত কলিঙ্গসেনা মগধসৈন্যকে আক্রমণ করল। তারা সংখ্যায় সহস্রাধিক হওয়া সত্ত্বেও সদ্য সুপ্তোত্থিত অবস্থায় এই অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবারও সময় পেল না, প্রায় সকলেই নিহত হ'ল। অবশিষ্ট কয়জন অশ্বমেধের অশ্বসহ বন্দী হ'ল। কেবল রাজগুরু মহাকাঞ্চন দুই জন পার্শ্বরক্ষী সহ কোনও মতে পলায়ন করতে সক্ষম হলেন।

পরদিন প্রভাতে মহাশাল বিজয়োল্লাসে অশ্বসহ কলিঙ্গ রাজধানী যাত্রা করল এবং মহারাজ খারবেল এই ঘটনার কোনও সংবাদ পাবার আগেই রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে সমস্ত বিষয় মহারাজের গোচর করল। তারপর সে অবনত মস্তকে মহারাজের মার্জনা ভিক্ষা করে বলল যে অবস্থাচক্রে এবং দূরতার কারণে মহারাজের আদেশ পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার উপায় ছিল না, সেই হেতু তাকে হঠাৎ স্বাধীনভাবে কাজ করতে হয়েছে।

মহারাজ সমস্ত শুনে অতীব প্রীত হয়ে আপন তরবারি কোষমুক্ত করে মহাশালের মস্তকে স্পর্শ করিয়ে তখনই তাকে তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ পদে বরণ করলেন।

মহাশাল নতমস্তকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তারপর বললেন,—মহারাজ, মগধসেনা আপাততঃ পরাজিত বটে, কিন্তু কলিঙ্গদ্রোহী মগধ-রাজগুরু মহাকাঞ্চন জীবিত। আমার দুর্ভাগ্য আমি দেশদ্রোহী মহাকাঞ্চনের ছিন্নমুণ্ড মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত করতে পারলাম না। মহাকাঞ্চন আমার অগ্রজ সহোদর, আমি জানি তিনি অতিশয় ধীমান্। তিনি মগধে ফিরে গিয়ে বিপুল সেনা সংগ্রহ করে কলিঙ্গ আক্রমণ

Digitized by srujan ka@gmail.com

করতে সমর্থ এতে কোনও সন্দেহ নেই। অতএব তার পূর্বেই কলিঙ্গসেনা চালনা ক'রে সম্ভব হলে অতর্কিতে মগধ আক্রমণ করা আবশ্যক। যে আগে প্রস্তুত হয়ে আক্রমণ করতে পারে তারই জয়ের সম্ভাবনা অধিক হয়। মহারাজ দাক্ষিণাত্য জয়ের পর উত্তরাখণ্ড বিজয় অভিযানে যাত্রা করবেন মনঃস্থ করেছিলেন বলে জানি। প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে অশোক কলিঙ্গ আক্রমণ করে অগণিত কলিঙ্গসেনা হত্যা করেছিলেন, তার প্রতিশোধ নেবার এই প্রকৃষ্ট সময়। মগধ জয় সম্ভব হ'লে কলিঙ্গরাজ্যের সীমা দক্ষিণে কাবেরী থেকে উত্তরে গঙ্গা অবধি ব্যাপ্ত হবে, বীর মহারাজ মহামেঘবাহন খারবেল ঐর-র যশোগাথা সর্বত্র গীত হবে।

বাস্তবিক মহারাজ খারবেল 'একরাট্' (রাজচক্রবর্তী) হবার এক আন্তরিক বাসনা পোষণ করছিলেন। মহাশালের উদ্দীপনাময় বাক্যে তাঁর উৎসাহ অধিকতর হ'ল। তিনি বিনা দ্বিধায় মহাশালকে কলিঙ্গসেনা নিয়ে মগধ অভিযানে যাবার জন্য প্রস্তুত হবার আদেশ দিলেন।

যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণার জন্য মহাশালের একটি গুপ্ত গবেষণাগার ছিল। অবসর সময়ে সে এখানে নানা অদ্ভুত অস্ত্র উদ্ভাবনের চিন্তা করত। তাতেই তার চিত্তবিনোদন হ'ত। এইভাবে সে মহাশৈলকণ্টক নাম দিয়ে এক নূতন অস্ত্র উদ্ভাবন করেছিল। এবার যুদ্ধাভিযানে তার ব্যবহার দেখাবে এই চিন্তায় হর্ষিত মহাশাল অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করতে আরম্ভ করল। এক মাসের মধ্যে তোমর পাশ কচগ্রহবিক্ষেপ করগ্রহবিক্ষেপ মূষল খড়্গ ও ঢাল প্রভৃতি প্রথাগত অস্ত্র এবং তার নিজ উদ্ভাবিত মহাশৈলকণ্টক স্তূপীকৃত হ'ল। বহু রথও নির্মিত হ'ল। সুসজ্জিত এক অক্ষৌহিণী সেনা এবং মহাসৈন্যাধ্যক্ষ মহাশালকে নিয়ে স্বয়ং বীর মহারাজ খারবেল মগধ অভিমুখে যাত্রা করলেন। তিনি সেনাদলের মধ্যস্থলে হস্তিপৃষ্ঠে রত্নখচিত করণ্ডকে আসীন ও পার্শ্বরক্ষিপরিবেষ্টিত হয়ে চললেন।

কলিঙ্গবাহিনী ত্বরিত গতিতে মাত্র এক মাসের মধ্যেই মগধে উপস্থিত হল। এদিকে মগধসেনা সুখিপল্লীর অরণ্যে পর্যুদস্ত হওয়া ও অশ্বমেধ অশ্ব হৃত হওয়ার কারণে বিব্রত হয়ে থাকায় তখনও সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত হতে পারেনি। বিশেষ, কলিঙ্গ সেনা মগধ আক্রমণ করতে আসবে এ কথাও তারা চিন্তা করেনি। তারা ভেবেছিল অশ্ব বন্দী করে কলিঙ্গসেনা আপন রাজ্যেই মগধের আক্রমণ আশঙ্কা করে তার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকবে। এখন হঠাৎ শত্রু স্বয়ং এসে উপস্থিত দেখে রাজা পুষ্যমিত্র অতি সত্বর সেনা প্রস্তুত করে গোরধগিরি নামক পর্বতে তাকে প্রতিরোধ করতে গেলেন। কিন্তু এই প্রকার অকাল-উদ্‌যোগের ফল সহজেই অনুমেয়। পর্বতের উপর অবস্থানরূপ সুবিধা সত্ত্বেও মগধসেনা কলিঙ্গের সুপরিকল্পিত আক্রমণে শোচনীয়ভাবে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হ'ল। কলিঙ্গের নূতন অস্ত্র মহাশৈলকণ্টক থেকে অগণিত

Digitized by srujan ka@gmail.com

শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়ে তাদের পর্যুদস্ত করল।

পরাজয় নিশ্চিত জেনে মহামন্ত্রী রাজগুরু মহাকাঞ্চন রাজা পুষ্যমিত্রকে অবিলম্বে সন্ধির উপদেশ দিলেন। বললেন,—বৎস, আমি কোনও রাজা বা রাজ্যর জয় বা পরাজয়ের জন্য তত চিন্তিত নই, কিন্তু মগধের পরাজয় অর্থ ধর্মের পরাজয় এবং ফলে নাস্তিক্যের প্রসার। কিন্তু আপাততঃ কলিঙ্গের সঙ্গে সন্ধিস্থাপনই শ্রেয়ঃ।

পুষ্যমিত্র সম্মত হলেন। মগধ শিবির থেকে একটি শ্বেত পারাবত উড্ডীয়মান হয়ে কলিঙ্গ শিবিরে গিয়ে নামল। তখন মগধ পক্ষ থেকে রাজগুরু মহাকাঞ্চন সন্ধির প্রতিজ্ঞাদি আলোচনার জন্য খারবেলের শিবিরে এলেন। এই আলোচনায় বিবিধ প্রতিজ্ঞার অন্যতম এই হল যে কলিঙ্গ থেকে অপহৃত জিন-মূর্তি ঋষভদেবকে পুষ্যমিত্র খারবেলের হস্তে প্রত্যর্পণ করবেন। বহুকাল পূর্বে মগধের নন্দ বংশীয় এক রাজা কলিঙ্গ জয় ক'রে এই দেবমূর্তি মগধে নিয়ে এসেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে লোকসাধারণে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত থাকলেও মহারাজ খারবেল জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। অপর পক্ষে খারবেল অশ্বমেধের যজ্ঞাশ্বটি পুষ্যমিত্রকে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হলেন। তা ছাড়া খারবেল দুই রাজ্যের মধ্যে বন্ধুতার নিদর্শনস্বরূপ আপন সৈন্যের কিয়দংশ মগধে রাখতে সম্মত হলেন যাতে যবনরাজ দত্তমিত্রের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধে মগধের সাহায্য হয়। অতঃপর খারবেল জিন-মূর্তি ঋষভদেবকে নিয়ে মহাসমারোহে আপন রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন।

যজ্ঞাশ্ব ফিরে আসার পর মগধে মহাকাঞ্চনের আদেশে পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের অবশিষ্ট ক্রিয়াকাণ্ড আরম্ভ হ'ল। তিন প্রধানা মহিষী 'ভূর্ভুবঃস্বঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে অশ্বটিকে মন্ত্রপূত বারিদ্বারা স্নান করালেন। সম্মানানুক্রমে পট্টমহিষী অশ্বের সম্মুখভাগ, দ্বিতীয়া মহিষী তার মধ্যভাগ ও তৃতীয়া মহিষী পশ্চাদ্ভাগ স্নান করিয়ে প্রত্যেকে এক শত অলঙ্কার দ্বারা অশ্বের মস্তক ও পুচ্ছ মণ্ডন করলেন। তার পর অশ্বটিকে অন্য ষোলটি পশুসহ অগ্নির নিকটে যুপে বন্ধন করা হল। অন্যান্য যূপের প্রত্যেকটিতে পনরটি করে পশু বাঁধা হ'ল। যুপমধ্যবর্তী স্থানগুলিকে তেরোটি করে বন্য পশুপক্ষী রক্ষিত হ'ল এবং পর্যগ্নিকরণের পর তাদের সকলকেই আবার মুক্ত ক'রে দেওয়া হ'ল। অতঃপর যজ্ঞাশ্বকে বহুমূল্য বস্ত্রদ্বারা আবৃত করা হ'ল এবং স্বয়ং পট্টমহিষী ঐ বস্ত্রের মধ্যে যজ্ঞাশ্বের সঙ্গে রাত্রিযাপন করলেন। পরদিন প্রাতঃকালে সেই অশ্বকে বধ করে তারই রক্তে তার মাংস সিদ্ধকরণান্তর অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হ'লে যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল।

এবার রাজচক্রবর্তী খারবেল রাজসূয় যজ্ঞ করবেন। সেজন্য তাঁর আমন্ত্রণক্রমে পুষ্যমিত্র তাঁর রাজগুরু মহাকাঞ্চনকে সেই যজ্ঞে প্রেরণ করলেন। রাজধানী কলিঙ্গ নগরে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনান্তে মহাকাঞ্চন মহারাজ খারবেলের নিকট বিদায় নিয়ে

Digitized by srujan ka@gmail.com

পাটলিপুত্র প্রত্যাবর্তনের পথে পিতামাতার দর্শন উদ্দেশ্যে একবার বহুদিন পরে আপন গ্রাম সুখিপল্লীতে আগমন করলেন। তাঁর সঙ্গে মহাশালও এল। প্রায় দ্বাদশ বৎসর পরে দুই ভ্রাতা বহু যশঃ অর্জন ক'রে নিজগ্রামে পদার্পণ করছেন জেনে পল্লীবাসীরা উৎসুক চিত্তে তাঁদের স্বাগত জানাতে উৎসবের আয়োজন করেছে এ কথা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা উৎসবের আগমন প্রত্যাশায় উদগ্রীব হয়ে আছে। কারও জয় অথবা কারও পরাজয়ে পল্লীবাসিগণের বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তারা কেবল আপন আপন জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা কয়েক দণ্ডের জন্য বিস্মৃত হতে সোৎকণ্ঠায় কিঞ্চিৎ উল্লাস ও বৈচিত্র্যের পথ চেয়ে থাকে।

॥ ৭ ॥

সোমদত্তের তৃতীয় ও কনিষ্ঠ পুত্র মহাসার সম্বন্ধে অধিক বলবার নেই। তার বাল্যকাল থেকেই পিতামাতা ধরে নিয়েছিলেন যে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের এই কনিষ্ঠ পুত্র কুলের সম্পূর্ণ অযোগ্য সন্তান, কুলপাংশুল। সে মহাকাঞ্চনের মত মেধাবী নয়, যদিও তীক্ষ্ণবুদ্ধি; মহাশালের মত বলশালীও নয়, যদিও স্বাস্থ্যবান্। অগ্রজদ্বয়ের ন্যায় তার কোনও উচ্চভিলাষও নেই। সোমদত্ত শতচেষ্টা করেও তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে বর্ণপরিচয়ের বাহিরে বেশী দূর অগ্রসর করাতে পারলেন না। তিনি যখন 'অমরকোষ' থেকে 'অমরানির্জরাদেবস্ত্রিদশাবিবুধাঃ সুরাঃ' কণ্ঠস্থ করাবার অথবা ফলক হাতে ধরিয়ে লেখাবার প্রয়াস পেতেন মহাসার তখন চিন্তা করত গৃহের পশ্চাদ্‌বাটিকায় যে কুষ্মাণ্ড লতা রোপণ করেছে তাতে আরও জলসিঞ্চন আবশ্যক কি না অথবা যে ভগ্নপদ সারমেয় শাবকটির পরিচর্যায় তাকে বহু কালক্ষেপ করতে হয় সে অনতিবিলম্বে আরোগ্যলাভ করবে কি না। ফলে পিতার কোনও প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল শূন্যদৃষ্টিতে পিতার মুখপানে চেয়ে থাকে এবং ক্রুদ্ধ পিতার লগুড়াঘাতে অশ্রুপাত করে। পিতা অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে যখন মহাসারকে মহাশালের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে বলেন তখন তার ষোড়শ বর্ষ বয়স। মহাসার অগ্রজের সঙ্গে বনে অস্ত্রশিক্ষা করতে গিয়ে বনের প্রান্তবর্তী তুন্নবায় পল্লীতে কলাবু নামক এক তুন্নবায়ের নিকট সূচীবিদ্যা শিক্ষা করতে লাগল। এতে মহাশাল বিরক্ত হলে সে বলে,—জীবন ধারণের জন্য ভল্ল অপেক্ষা সূচীর উপযোগিতা সমধিক, ক্ষমতা বিস্তারের জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু তার তিলমাত্র অভিলাষ আমার নেই, আমি অস্ত্রকে ঘৃণা করি।

সোমদত্ত এ কথা শুনে হতাশ হলেন এবং মহাসারকে মহাশালের নিকট হ'তে নিয়ে গৃহেই রাখলেন। মহাসার অতি সুশীল, সে গৃহে থেকে সামান্য পৈতৃক সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতে লাগল ও তার সঙ্গে বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবায় মন দিল। প্রাতে তাঁদের জন্য দন্তকাষ্ঠ সংগ্রহ, স্নানোদক, আনয়ন, তাঁদের পাদপ্রক্ষালন আদি সেবাকার্য,

Digitized by srujan ka@gmail.com

অতঃপর গৃহমার্জনা, গোসেবা, ইন্ধন সংগ্রহ, ভূমি কর্ষণ আদি গৃহকর্ম করার পরে যে সময় উদ্‌বৃত্ত থাকে তাতে সে কলাবুর গৃহে গিয়ে সূচীবিদ্যা শিক্ষা করে।

বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যথাকালে মহাসার যখন কলাবুর একমাত্র সন্তান তার কন্যা ইরাকে বিবাহ করল তখন সোমদত্ত ও কাত্যায়নী দেবী লজ্জায় ব্রাহ্মণ সমাজে মুখ দেখাতে পারলেন না। ব্রাহ্মণ সমাজও নীচকুলে বিবাহ হেতু মহাসারকে সমাজচ্যুত করলেন। ফলে মহাসার নিজগৃহ ও পিতামাতার সান্নিধ্য ত্যাগ করে তার সূচীগুরু শ্বশুর কলাবুর গৃহে গিয়ে থাকতে বাধ্য হ'ল।

কিছুকাল পরে কলাবু ইহলোক ত্যাগ করাতে মহাসার শ্বশুরের ব্যবসায় গ্রহণ করল। ততদিনে সে সীবনবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছে। আপন অধ্যবসায় এবং তার স্ত্রী ইরার সহায়তায় সে এক নিপুণ তুন্নবায় রূপে এই সূচীকর্মের ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করতে লাগল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে তিনটি সন্তানের পিতাও হ'ল।

পিতামাতার সান্নিধ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হলেও মহাসার তাঁদের সেবা করা থেকে বিরত হয়নি। নিজের নানা কার্য সত্ত্বেও সে তুন্নবায় পল্লী থেকে নিত্য সুখিপল্লীতে এসে যথাসাধ্য তাঁদের সেবা করে যায়। প্রাতঃকালে প্রথমে তাঁদের সেবা ও তাঁদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাঁদের দিয়ে অতঃপর সে নিজ পরিবারের কাজ করে। সুখিপল্লীর ব্রাহ্মণেরা মহাসারকে তুন্নবায় বলে উপহাস করে। মহাসার স্মিত হেসে বলে,— আপনারা যথার্থ বাক্য বলে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কাজই করেন, আপনাদের প্রণাম। তার এইরূপ নির্বিকার ভাব হেতু উপহাসকারীরা প্রত্যাশিত আমোদ না পেয়ে ক্রমে ক্ষান্ত হন। মহাসারের সরল ও সৎ স্বভাবের জন্য পল্লীবাসীরা ক্রমে তাকে শ্রদ্ধা করতে লাগল।

মহাসারের গৃহদ্বার থেকে কোনও ভিক্ষুক কখনও নিরাশ হয়ে ফেরে না। প্রতিবেশীদের বিপদে আপদেও সে উদাসীন থাকতে পারে না। সর্বদাই আগুসার হয়ে এসে সাধ্যমত সাহায্য করে। কালক্রমে বন্ধুজনের নিত্য যাওয়া আসায় মহাসারের গৃহ যেন এক প্রকার আনন্দময় সাধারণ প্রমোদগৃহ হয়ে উঠল।

সোমদত্ত ও কাত্যায়নী দেবী ক্রমশঃ সম্পূর্ণ ভাবেই মহাসারের সেবা ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁদের সেবাকারী এই কনিষ্ঠ পুত্র ব্রাহ্মণকুল -কলঙ্ক এ দুঃখ সর্বদাই তাঁদের পীড়া দেয়। মহাসারের সমস্ত সেবাযত্ন সত্ত্বেও সেই পীড়া তাঁদের অন্তরে মহাসারের প্রতি কেবল অবজ্ঞার জন্ম দেয়। সেই অন্তরের সমস্ত স্নেহশ্রদ্ধা কেবল তাঁদের যশস্বী পুত্রদ্বয়ের জন্যই সঞ্চিত থাকে।

Digitized by srujan ka@gmail.com

বহু বৎসর পরে দুই মহাযশস্বী পুত্র পিতামাতার দর্শনাভিলাষী হয়ে তাদের জন্মস্থানে আসছে এই সংবাদ বৃদ্ধ পিতামাতার গোচরে আসা মাত্র তাঁরা উভয়ে আনন্দে অধীর হলেন, তাঁদের গণ্ডদেশ আনন্দাশ্রুতে প্লাবিত হ'ল।

মহাকাঞ্চন রাজকার্যে ব্যস্ত থেকেও পিতামাতার সংবাদ রাখত। মহাশাল সে চেষ্টা করেনি। তবে পিতামাতার প্রতি উভয়েই ভক্তিমান হয়েও উভয়ের কেহই তাঁদের পরিণত বয়সে তাঁদের কোনো সেবায় নিয়োজিত হতে পারেনি। কিন্তু সে জন্য সোমদত্ত ও কাত্যায়নীর কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই। অপর পক্ষে এই দুই পুত্রের যশঃ ও গৌরবে তাঁরাও আজ যশস্বী ও গৌরবান্বিত, তাঁদের অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত। শারীরিক সুখ ও তৃপ্তি তার নিকট তুচ্ছ।

প্রতীক্ষিত দিনটি আগত হতে সোমদত্ত ও কাত্যায়নী সকাল সকাল পল্লীপ্রান্তবর্তী উৎসবস্থলীর উদ্দেশে পদযাত্রা করলেন। এত বয়সে পথ চলার ক্লেশ তাঁদের ক্লেশ বলেই মনে হল না। ওদিকে মহাসার ও ইরাও তাদের সন্তানদের নিয়ে সকলে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করে সেই উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। দূরে মহাকাঞ্চন ও মহাশালের দুইখানি রথ দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র পল্লীবাসীরা বিপুল হর্ষধ্বনি করে উঠল এবং গীতবাদ্যসহ প্রত্যুদ্‌গমন করবার জন্য অগ্রসর হ'ল। সকলের সঙ্গে মহাসার এবং ইরাও পরস্পরের হস্তধারণ করে দুই সন্তানকে দুই স্কন্ধে ও একটিকে ক্রোড়ে নিয়ে চলল।

মহাকাঞ্চনের পূর্ববৎ উন্নত সুঠাম শরীর ও তেজোদীপ্ত মুখমণ্ডল। কেবল তার সেই সুগৌর দেহ নিরন্তর যজ্ঞাদির সান্নিধ্য হেতু তাম্রবর্ণ ধারণ করেছে। তার মস্তক মুণ্ডিত, কপালে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক লেলিহান অগ্নিশিখার ন্যায় দেদীপ্যমান। তার পরিধানে গৈরিক বাস ও গৈরিক উত্তরীয় ও পূর্ববৎ তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল তার অক্ষিযুগল, সমস্ত দেহ যেন একটি চলিষ্ণু অগ্নিশিখা। মহাশালেরও পূর্বের ন্যায় বিশাল বপু, কেবল তাতে কিঞ্চিৎ মেদবৃদ্ধি এবং ভাবে মদবৃদ্ধি লক্ষণীয় তার অঙ্গে রত্নখচিত লৌহবর্ম, পার্শ্বে দীর্ঘ তরবারি লম্বমান, স্কন্ধে ধনুক ও তূণীর, মস্তকে মহামূল্য উষ্ণীষ।

মহাকাঞ্চন রথ হতে অবতরণ মাত্রে পল্লীবাসীদের মস্তক স্বতঃপ্রণত হ'ল, মহাকাঞ্চন স্মিতমুখে সকলকে আশীর্বাদ করল। পশ্চাতে চেয়ে দেখল মহাশাল তখনও তার রথ থেকে নামেনি। মহাকাঞ্চন সহজেই অনুমান করল মহামানী মহাশাল কিসের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু পল্লীবাসীদের মধ্যে সেরকম উপযুক্ত লোক না থাকায় মহাকাঞ্চন ঈষৎ হেসে স্বয়ং মহাশালের দিকে হস্তপ্রসারণ করে তাকে রথ হতে নামিয়ে দিল।

জনতা দুই ভ্রাতাকে নিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে উৎসবস্থলের দিকে অগ্রসর

Digitized by srujan ka@gmail.com

হ'ল। আগে স্মিতবদন মহাকাঞ্চন, পিছনে তরবারির কারণে জনতা থেকে কিঞ্চিৎ দূরত্ব সৃষ্টি করে মহাশাল। ক্রমে তারা পিতামাতার নিকটস্থ হ'লে তাঁদের ভূমিষ্ঠ প্রণাম করল। কাত্যায়নী দেবী আশীর্বাদ করতে ভুলে গিয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। সোমদত্ত বাষ্পাকুল নয়নে যথাবিধি আশীর্বাদ করলেন। তখন মহাকাঞ্চন জিজ্ঞাসা করল,—পিতা, মহাসারকে দেখছি না, সে কোথায়? জনতার মধ্য থেকে কাউকে সবিদ্রূপে বলতে শোনা গেল—এই যে মহামূর্খ এইখানে! অনেকে হেসে উঠল।

মহাসার লোকসমাজে আপন স্থান তার সুব্রাহ্মণ অগ্রজদের চাইতে বহু নিম্নে জেনে সম্মুখে না এসে পশ্চাতে দাঁড়িয়েছিল। এখন জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাকে দেখতে চাইছেন শুনে বড় আনন্দিত হয়ে সপরিবারে ভিড় ঠেলে অগ্রবর্তী হ'ল। নিজে মহাকাঞ্চনকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল। তার আদেশে তার স্ত্রী ও সন্তানেরাও তাই করল। মহাকাঞ্চন তাদের মস্তক আঘ্রাণপূর্বক আশীর্বাদ করে বলল,—বাঃ, মহাসারের সন্তানগুলি বেশ সবল ও সুস্থ হয়েছে, আনন্দের কথা। তখন মহাসার সপরিবারে মহাশালকেও প্রণিপাত করল। মহাশাল ঈষৎ মস্তক হেলনে তাদের প্রতি আশীর্বাদ জ্ঞাপন করল।

পল্লীবাসীরা শোভাযাত্রা করে মহাকাঞ্চন, মহাশাল ও তাদের বৃদ্ধ পিতামাতাকে নিয়ে এসে এক বৃক্ষতলে কাষ্ঠাসনে বসাল। তখন উৎসব আরম্ভ হল। যুবকেরা নানা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শন করল। মধুকরও নিজের রচিত নাটক থেকে কিছু আবৃত্তি করল এবং ভোজবাজি দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ করল। তারপর যুবতীদের নৃত্যগীত আদি আরম্ভ হ'ল।

মহাকাঞ্চন ও মহাশাল উৎসবস্থলে কিছুক্ষণ থেকে পিতামাতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বগৃহে গমন করল। মহাসারও সপরিবারে সঙ্গে গেল। অন্যান্যরা প্রায় সকলেই সারা দিন উৎসব করে রাত্রিতে প্রীতিভোজেনের পর স্ব-স্ব গৃহে ফিরে গেল।

মহাশাল ইতিমধ্যে কোনও পল্লীবাসীর কাছে মহাসারের বিষয় সমস্ত শুনেছে। গৃহে ফেরা মাত্র উদ্দীপ্ত কণ্ঠে সে মহাকাঞ্চনকে বললে,—মহাকাঞ্চন, মহাসার আমাদের বংশের মর্যাদা ও গৌরবের মূলে কুঠারাঘাত করেছে।

মহাকাঞ্চন এতে বিচলিত না হয়ে বলল,—আমি জানি তুমি কি বলতে যাচ্ছ।

মহাশাল আশ্চর্য হয়ে বলল,—বটে, তুমি তাহ'লে সব জান? অথচ সব জেনেও তুমি...

মহাকাঞ্চন তেমনি শান্তভাবেই বলল,—হাঁ, আমি অনেক দিন থেকেই জানি। দূরে থেকে আমি পিতামাতার সেবাসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমি তাঁদের সংবাদ সংগ্রহ করেছি।

মহাশাল কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে বলল,—কলিঙ্গের বিরাট সেনাদলের সেনাধ্যক্ষ

Digitized by srujan ka@gmail.com

হওয়া মানে যে কি দুরূহ কার্যভার বহন করা তা তুমি স্বচক্ষেই দেখে এসেছ। এ সব সামান্য কাজের সময় আমার হয় না। কিন্তু মহাসারের বিষয় যখন তুমি আগে থেকেই জানতে তবে তার প্রতিকার না করে স্থির থাকলে কি ক'রে? পিতা যদি আমার পূর্বে সংবাদ দিতেন আমি কঠোরভাবে এর প্রতিকার করতাম।

মহাকাঞ্চন বলল,—আমাদের দুইজনের অনুপস্থিতিতে মহাসার পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের সেবা করেছে। তাই তার নীচকুলে বিবাহ ও নীচ জীবিকা অবলম্বনকে আমি ক্ষমার যোগ্য বিবেচনা করি।

মহাশাল ঘৃণাভরে বলল,—মহাকাঞ্চন, আমি সৈনিক। আমি বংশমর্যাদাকে সর্বোচ্চ স্থান দিই। বংশমর্যাদার হানি ঘটলে যে গুরুতর পাপ হয় তার তুলনায় পিতামাতার সেবাজনিত পুণ্য অতি সামান্য।

মহাকাঞ্চন বলল,—মহাশাল, পাপপুণ্যের কথা আমার অধিক জানা আছে এ কথা তুমি স্বীকার করবে। তুমি তো নাস্তিকের কর্মচারী মাত্র। পিতামাতার সেবা যে কতবড় পুণ্যকর্ম তা উপলব্ধি করবার শক্তি তোমার কোথা থেকে আসবে। এখনও তো তুমি তাঁদের দর্শনজনিত পুণ্যের জন্য আস নি। তুমি যে অভিপ্রায়ে এসেছ তা আমার অজ্ঞাত নয়।

—তুমি কিছু জান না।

—আমি যা জানি তা প্রকাশের সময় এ নয়। এইটুকু বলে রাখি যে বিনীতা এখন অন্য মার্গে। তবে সে যাই হোক, তুমি যে খ্যাতি অর্জন করেছ তাতে মহাসারের কলঙ্কের জন্য তোমার চিন্তার কোনও কারণ নেই। তুমি তোমার খ্যাতি ও যশের বলে বৌদ্ধরাজ্যের প্রাদেশিকের কন্যা বিনীতার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব অবশ্যই দিতে পার।

—মহাকাঞ্চন, বিনীতার সঙ্গে তোমার প্রেমের বিষয় আমার অজ্ঞাত বলে মনে করো না। তুমি যে সেই প্রকার উদ্দেশ্যে আস নি তারই বা প্রমাণ কোথায়। যাদের মৌখিক আদর্শ ও অন্তরের কামনায় আকাশ পাতাল প্রভেদ শাস্ত্রে তাদের কি বলে তা তুমি অধিক জান, স্বীকার করি। তবে আমি জানি তাদের পরাজয় সুনিশ্চিত। তুমিও তা ভালমতেই অনুভব করেছ।

মহাকাঞ্চনের দুই চক্ষু জ্বলে উঠল কিন্তু সে আত্মসংবরণ ক'রে নিরুত্তর রইল।

মহাসার তার ভার্যা ও সন্তানদের তার পিতামাতার কাছে রেখে নিজে অগ্রজদের কাছে এসে অধোবদনে তাঁদের বাদানুবাদ শুনছিল। এখন তাঁদের মধ্যে অপ্রীতিকর কিছু ঘটবার উপক্রম দেখে সে মুখ খুলল। বলল,—আপনারা শান্ত হোন। সব বংশেই কোনও সময়ে এক কুলকলঙ্কের উদ্ভব হয়। কেবল সেই কথা ভেবে আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাদের যশঃ ও বিপুল কীর্তির কথাই লোকে চিরকাল বলবে, আমার

Digitized by srujan ka@gmail.com

কথা ভুলে যাবে। কাজেই আমাদের বংশের গৌরব অক্ষুণ্ণ ও চির উজ্জ্বল থাকবে। সে আপনাদেরই জন্য।

মহাশাল গর্জন করে বলল,—তোমাকে ধিক্, শত ধিক্। আমার কীর্তি তুমি তোমার অকীর্তি দিয়ে অবলিপ্ত ক'রে দিয়েছ।

মহাসার বিনীতভাবে বলল,—ভ্রাতঃ, সমস্ত বিষয়টিকে একটু সহজ দৃষ্টিতে দেখুন। কোনও বিষয় বা সমস্যাকে যদি কেবল নিজের বা বংশের; ধর্মের বা জাতির মর্যাদার দিক থেকেই দেখা যায়, তবে বিষয়টি অযথা বৃহৎ ও জটিল মনে হয়। মনে করুন, ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে একজন আর একজনের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ এমনকি হত্যার চেষ্টা করল। তাদের মধ্যে দৈবাৎ একজন হয়তো ব্রাহ্মণ অপর জন বৌদ্ধ অথবা জৈন। এখন, আমরা যদি এতে দুই জনের মধ্যে স্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তজ্জনিত নিন্দনীয় বিদ্বেষের কথা না ভেবে এর মধ্যে আরো অনেক বেশী নিন্দনীয় ধর্মীয় বিদ্বেষ কল্পনা ক'রে বসি—যেহেতু সে দুইজন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী—তাহলে তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি কত গুরুতর হয়ে পড়ে একবার চিন্তা করুন। আমরা স্বয়ং ব্রাহ্মণ ব'লে হয়তো একজনের পক্ষ অবলম্বন করে বসব, ফলে হয়তো ন্যায় বিচার করতে অক্ষম হব। কিন্তু দুই জনকে কেবল মানুষ হিসাবে দেখলে তাদের ন্যায়ান্যায়ের কথাই কেবল চিন্তা করব এবং ফলে ন্যায়বিচার করতে পারব।

কিন্তু তার জ্যেষ্ঠদ্বয়ের ব্রাহ্মণত্বের অভিমান অধিক। উপরন্তু মহাশালের শক্তির মদ। মহাসারের কথা তার একেবারেই ভাল লাগল না। সে বললে,—তুমি অন্ততঃ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত কাজ পৌরোহিত্য অবলম্বন করতে পারতে। তা না করে তুমি নীচ তুন্নবায়ের ব্যবসায়ে লিপ্ত হ'লে।

—পুরোহিত হবার কথা আমি ভাবিনি তা নয়। ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়ায় স্বভাবতঃ সেই কথাই আগে মনে এসেছিল। কিন্তু আমার এক দোষ, ভাবতে গিয়ে কিছু অধিক ভাবা। আমার মনে হ'ল পুরোহিত যেন মানুষ ও ভগবানের মধ্যে এক প্রকার মধ্যসত্ত্বাধিকারী স্বরূপ। অপর পক্ষে তুন্নবায় বলুন তন্তুবায় বলুন এমনকি, রাজপথসম্মার্জক বলুন সকলেই সমাজের অতি প্রয়োজনীয় কাজ করে দেয়, পরিবর্তে সামান্য বেতন পায়। জীবন ধারণের তেমন সরল ও সৎ মার্গ।

এ কথার সত্যতা অস্বীকার করতে না পেরে মহাশাল এবার প্রায় ধৈর্যহারা হয়ে তরকারি কোষমুক্ত করে সগর্জনে অগ্রসর হ'ল। মহকাঞ্চন ঝটিতি উঠে মহাসারকে অন্তরাল করল। মহাশাল নিরস্ত হ'ল। তখন মহাসার অগ্রজদ্বয়কে নমস্কার করে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে স্বগৃহে ফিরে গেল।

Digitized by srujan ka@gmail.com

॥ ৯॥

এদিকে আগে চম্পার মা এবং অনেক পরে ঈষৎ মত্ত অবস্থায় মধুকর উৎসব থেকে গৃহে ফিরে এসেছে— তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। রাত্রিভোজনান্তে মধুকর শয়ন করতে গেল। আজ কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় মাধ্বী পানের জন্য তার মন বড়ই প্রফুল্ল। উপরন্তু উৎসবে সে তার নাটক থেকে আবৃত্তি করে বহু প্রশংসা পেয়েছে। এখনও তাই উচ্চকণ্ঠে সেই সব আবৃত্তিই করে চলেছে, নিদ্রাকর্ষণ হয়নি।

ততক্ষণে চম্পার মা সমস্ত গৃহকার্য সমাপন করে যখন দেখল মধুকর তখনও জাগ্রত ও আবৃত্তিরত তখন ধীরে তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে বলল,—মধুকর, বিশেষ কথা আছে। তুমি তোমার প্রলাপ বন্ধ কর।

মধুকর নিজ ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন ক'রে বলল,—নারী, তুষ্ণীম্ভব। এ যুগের মহাকবির নাটক শ্রবণ কর—

মধুকর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া অনর্থক কালক্ষেপে রাজি না থাকায় বললেন,—সেই অধম মহাকবি কে তা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তার পুথিগুলি আমার হস্তগত হ'লে উত্তম ইন্ধন হতে পারত। তবে এখন তা থাক্, আমার কথা শোন।

—হায় নারী, তুমি চিরদিন নারী! চাণক্য যথার্থই বলেছেন নখী-দন্তী-শৃঙ্গী-স্ত্রীণাম্—

—দশ কিংবা শতহস্তেন, তাই তো? নখী দন্তী প্রভৃতি ঠিক আছে, কিন্তু স্ত্রীণাং সম্বন্ধে ভগবান চাণক্যের নিতান্ত প্রতিকূলাচরণ করেছেন, লোকে তাঁর কথামত চলতে চায় না, তার ঠিক বিপরীত আচরণ করে। তা, এখন শোন।

—বদন্তু আর্যে, বদন্তু সত্বরম্।

তখন চম্পার মা চম্পার ভগবদ্দর্শনের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করল। সমস্ত শুনে মধুকর কেবল হেসে বললে,—অলীক স্বপ্ন ব্যতীত এ আর কিছু না।

—আমি তো চম্পাকে তাই বললাম। কিন্তু সে যে ভাবে সমস্ত বলছে তাতে স্বপ্ন বলেও মনে হয় না।

মধুকর চিন্তা করে বলল,—আমি চম্পার মুখ থেকেই সব শুনতে চাই।

তখন চম্পা এসে বিশদভাবে সমস্ত ঘটনাটি আর একবার বলে গেল।

মধুকর সস্নেহে চম্পার মস্তকে হাত রেখে বলল,—মা, ভগবান আছেন এ কথার প্রমাণ আজ পর্যন্ত মেলেনি। তিনি যদি থাকেন তাঁর রূপ কি প্রকার তাও কেউ জানে না। তাঁর যদি কোনও প্রকার রূপ বা আকার থাকে তবে তা দেখতে গেলে যোগ-সাধনা দরকার বলে অনেকে বলেন। তোর কি—সাধনা আছে?

Digitized by srujan ka@gmail.com

—মধুকাকা, আমার দুঃখই আমার সাধনা। চম্পা আর বলতে পারল না, কান্নায় তার গলা বুজে এল।

মধুকর তার অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে বলল,—মা, তুই বুঝিস না। তোর এ কথা প্রকাশ পেলে বড় বিভ্রাট হবে। বৌদ্ধরাজ্যের প্রাদেশিক সুভদ্রদেব বৌদ্ধমত পোষণ করেন। তাঁর একমাত্র কন্যা বিনীতা ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করেছেন। এদিকে কলিঙ্গ সম্রাট খারবেল স্বয়ং জৈন, আবার তাঁর মহাসৈন্যাধ্যক্ষ সোমদত্তপুত্র মহাশাল ব্রাহ্মণ, এখন সুখিপল্লীতে এসেছেন। আর, যার আদেশ পেলে তুই আবার চলতে পারবি বলে তোর বিশ্বাস সেই মহাকাঞ্চনও ব্রাহ্মণ—যিনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে ঘৃণা করেন। একথা আজ তো তোদের কাছে গল্প করেছি। তিনিও খেতে খেতে এখন সুখিপল্লীতে। তোর ভগবৎ দর্শনের কথা প্রকাশ পেলেই অমনি প্রশ্ন উঠবে তিনি কোন ভগবান, কাদের ভগবান। আর তা নিয়ে একবার বিতর্ক শুরু হ'লে কোথায় গিয়ে শেষ হবে কে জানে। এখন এ কথা প্রকাশ না করাই ভাল। পরে ভেবে চিন্তে তোকে বলব কি ভাবে কি করা যাবে। কেবল মানুষ আর তার ভগবান, মাঝে আর কেউ নেই— এমন হলে কথা ছিল না।

চম্পা বড় অধীর হয়ে বলল,—সে তিনি যারই ভগবান হোন, মহাকাঞ্চন যে সোমদত্তের পুত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধার্মিক এতে তো সন্দেহ নেই। আর, আমি শুনেছি যোগীদার অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে। মহাকাঞ্চন আদেশ দিলেই আমি আমার পা ফিরে পাব এতে আমার সন্দেহ নেই। এতে সন্দেহ করার কিছু নেই, মধুকাকা। তুমি মহাকাঞ্চনকে এ কথা জানাও।

মধুকর বলল,—আচ্ছা, এখন তুই শো গিয়ে, কাল যা করবার করা যাবে।

চম্পা শুতে চলে গেলে মধুকর তার ভ্রাতৃজায়াকে বলল,—উৎসবে যেতে না পেরে চম্পার অত্যন্ত দুঃখ হয়েছে, তাই এ প্রকার স্বপ্ন দেখেছে। আজ রাতটা সুনিদ্রা হ'লে কাল সকালে সে নিজেই বুঝতে পারবে তার ভগবদ্দর্শন অলীক স্বপ্নমাত্র। এখন, যাও নারী নিজ শয্যায় আমি নিদ্রাতুর।

পরদিন প্রভাত হতে না হ'তেই চম্পা উঠে মধুকরকে শয্যা থেকে ঠেলে তুলে বললে,—মধুকাকা, সকাল হয়েছে, ওঠ। মহাকাঞ্চনের কাছে যাবে না?

মধুকর বিস্ময় ও সংশয়ে আন্দোলিত হয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। ভাবল, তবে কি চম্পার স্বপ্ন স্বপ্ন নয়, সত্য?

সেদিন মাসের কোনও পক্ষের চতুর্দশ দিবস থাকায় চম্পার মা প্রাতিমোক্ষ পালনের জন্য প্রাতঃকালে স্নান করে সুখিপল্লীর বৌদ্ধ বিহারে গেল। তত্রত্য বৌদ্ধ সঙ্ঘের সিদ্ধাচার্য ধর্মপাল সেখানে বাস করেন। তিনি বজ্রযানপন্থী। সুখিপল্লীর আর্য-আর্যানীগণ (গৃহস্থ বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণী) মাসের প্রত্যেক পক্ষের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ দিবসে

Digitized by srujan ka@gmail.com

প্রাতিমোক্ষের জন্য বিহারে গমন করেন। সিদ্ধাচার্য সেদিন বহুমূল্য বস্ত্র-পরিধান করে মহার্ঘ আসনে উপবেশন করতঃ বহুসংখ্যক পাপের নাম বলে যান। যে সেইগুলির মধ্যে কোনও পাপ করে থাকে সে তখন তা স্বীকার করে এবং পাপের মাত্রা অনুসারে সিদ্ধাচার্য তার অর্থদন্ড বিধান করেন।

প্রাতিমোক্ষের পর ধর্মপালকে একান্তে পেয়ে চম্পার মা কন্যার ভগবৎ দর্শনের বিষয় বর্ণনা করল। আবার মধুকরের পরামর্শের কথাও বলল। ধর্মপাল সব শুনে বললেন,—আমি মনে করি মধুকর অতিশয় পাপী। কিন্তু এ কথা প্রকাশ না করতে ব'লে সে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। আমি এ কথা বজ্রগুরুর গোচর করব। 'কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝণে বখাণে অপইঠান মহাসুখলীলে দুলখ পরম নীবাণে'। মন্ত্র-তন্ত্র ধ্যান-ব্যাখ্যানে লাভ নেই, বজ্রগুরুর আদেশ মতে চললে মহাসুখ লাভ হয়, সেই দুর্লক্ষ্য পরম নির্বাণ। চম্পা যে বালকরূপী বজ্রসত্ত্বের দর্শন পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আমি কাল বজ্রগুরুর সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করব। আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি কাকেও কিছু বলবে না, বিশেষতঃ প্রাদেশিকের কন্যা বিনীতাকে।

চম্পার মা বিদায় নিল। ধর্মপালও ব্যস্তভাবে বজ্রগুরুর নিকট যাবার আয়োজন করতে লাগলেন। গুরুর নিকট হতে অনুমতি পেয়ে যদি স্বয়ং ধর্মপালই চম্পাকে আদেশ করেন আর তাতে চম্পা তার পা দুইখানির চলৎশক্তি ফিরে পায় তাহলে ধর্মপালের প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এই আশায় তিনি অধীর হলেন।

এদিকে চম্পার মায়ের অসাবধানতায় কথাটা প্রকাশ পেয়ে যেতে পারে ব'লে যে ভয় ধর্মপাল করছিলেন যথার্থ তাই হল। চম্পার মা প্রত্যহ পুষ্প চয়ন করে বিনীতাকে দিতে যায়। প্রথমে সে ধর্মপালের বারণ সম্বন্ধে সাবধান ছিল, কিন্তু দুই তিন দিন পরেই এই সংগুপ্তির পীড়া তার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠল। সে বিনীতার নিকট অদ্যাবধি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিনীতাকে কোথাও সে কথা প্রকাশ করতে বারণ করল! অতঃপর সে নিজেই ক্রমে ক্রমে তার পরিচিত সবাইকে সব কথা সবিস্তারে বলল এবং যথারীতি তা অপরকে বলতে বার বার বারণ করল।

॥ ১০॥

বৌদ্ধরাজ্যের বর্তমান প্রাদেশিক সুভদ্রদেবের সুরম্য প্রাসাদ সুখিপল্লীর অনতিদূরে মহানদীর তীরে অবস্থিত। পাঠক অবগত আছেন যে তাঁর অন্তরের বাসনা তিনি রাজুক হবেন। সম্রাট খারবেল কবে তাঁকে সেই পদে উন্নীত করবেন তিনি তাই নিরন্তর আশা ও চিন্তা করেন। সম্রাটের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব ও পশ্চিম দিকের অভিযানের প্রত্যেকটিতেই সুভদ্র প্রচুর অর্থ ও সৈন্য সাহায্য করে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হয়েছেন।

Digitized by srujan ka@gmail.com

একদিন সুযোগ বুঝে সুভদ্র তাঁর একমাত্র সন্তান তাঁর কন্যা বিনীতার সঙ্গে সম্রাট পুত্র কুডেপ-এর বিবাহের প্রস্তাব করে বিনীত অনুরোধ করেছিলেন। সম্রাট তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি, তবে বলেছিলেন কুডেপ এখন দ্বাদশ বৎসরের বালক মাত্র, আর তিন বৎসর পরে কুডেপ যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হ'লে তখন যেন সুভদ্র পুনরায় প্রস্তাব আগত করেন। সুভদ্র তাই কলিঙ্গ যুবরাজের সঙ্গে বিনীতার বিবাহ এক প্রকার নিশ্চিত জ্ঞান করেন।

পিতামাতার একমাত্র সন্তান অতিশয় আদরে লালিতা পালিতা বিনীতা তাই আবাল্য দুর্বিনীতা। কন্যার সুশিক্ষার জন্য একবার সুভদ্র জনৈক আচার্য নিযুক্ত করেছিলেন। বিনীতার অমনোযোগিতার জন্য আচার্য একদিন তাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। উত্তরে বিনীতা আচার্যদেবকে তার পাঠ্য পুঁথি দিয়ে প্রহার করে। সুভদ্র এ কথা শুনে আচার্যকে বললেন,—মহাশয়, আমার কন্যা কলিঙ্গের সম্রাজ্ঞী হবে, আপনি তাকে সেই প্রকার জ্ঞান করেই বিদ্যাশিক্ষা দেবেন। এর পর বিনীতার বিদ্যাশিক্ষা স্থগিত রইল।

অধুনা বিনীতার বয়ঃক্রম মাত্র দ্বাদশ বৎসর হলেও দেহে ও মনে সে এখনই পরিপূর্ণা নারী। একদিন বিনীতা তার পরিচারিকা সহ মহানদী তীরে সান্ধ্যভ্রমণ কালে নদীতে স্নানরত এক যুবককে দেখতে পেল। তার সুঠাম দেহশ্রী বিনীতার চোখে অসামান্য মনে হ'ল, সে তার দিকে অনিমিষে চেয়ে রইল। যুবক স্নান সমাপন করে চ'লে গেলে বিনীতা পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করল যুবকটি কে। পরিচারিকা এক প্রকার তাচ্ছল্যের সঙ্গে বলল সে সুখিপল্লীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম মহাকাঞ্চন। নবীন বয়সী মহাকাঞ্চন সে সময়ে পিতার নিকটে বিদ্যাশিক্ষা করছিল।

বিনীতা সেদিন অন্যমনস্ক হয়ে নীরবে প্রাসাদে ফিরল। সে রাত্রে তার নিদ্রা হ'ল না। সেই নবীন যুবকের সুঠাম মূর্তি ও লাবণ্যময় মুখ মূর্তি কেবল তার নয়নে ভেসে উঠতে লাগল, তার শরীর রোমাঞ্চিত হ'তে লাগল।

বিনীতার নিজের রূপ-লাবণ্যের যথেষ্ট গর্ব ছিল। তার বিশ্বাস তার আকর্ষণী শক্তির সামনে কেউ স্থির থাকতে পারবে না। মহাকাঞ্চনের উপর সেই শক্তির প্রয়োগ করতে সে প্রত্যহ নদীতীরে সান্ধ্যভ্রমণে যেতে লাগল। মহাকাঞ্চন যতক্ষণ স্নান ক'রে বিনীতা অনতিদূরে লাস্যময় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মহাকাঞ্চনের দিকে নয়নবাণ নিক্ষেপ করতে থাকে। এইভাবে কিছুদিন গেল কিন্তু মহাকাঞ্চন তার প্রতি আকৃষ্ট হবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। স্নান শেষ হলেই মহাকাঞ্চন কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করে ত্বরিতে কোথায় অপসৃত হয়। বিনীতার ধৈর্য ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে বিফলতার কারণে ক্রোধ তেমনই বর্ধিষ্ণু ও কামনা ততই উন্মাদিষ্ণু হ'ল।

Digitized by srujan ka@gmail.com

অবশেষে বিনীতা আহার নিদ্রা ভুলে মহাকাঞ্চনকে বশীভূত করবার চিন্তায় মগ্ন হ'ল।

বিনীতার এই অবস্থায় একদিন মহাকাঞ্চন সন্ধ্যাস্নান সমাপনান্তে তীরে উঠে এক মুহূর্তের জন্য তার দিকে নয়নপাত করল। বিনীতা সেই নয়নে ভাবান্তর কল্পনা করে হর্ষিতা হ'ল। উত্তরে মহাকাঞ্চন উন্মনাভাবে ঈষৎ হেসে চ'লে গেল।

বিনীতার ধারণা হ'ল তার আকর্ষণী শক্তির জয় হয়েছে। সে হৃষ্টচিত্তে প্রাসাদে ফিরে শয়নগৃহে তার পালঙ্কে শুয়ে বল্‌গাবিহীন কল্পনায় মত্ত হ'ল, তার আনন্দজনিত লোমহর্ষণ হ'তে লাগল। সে উপলব্ধি করল এ কেবল তার বালিকাসুলভ কৌতুক নয়, মহাকাঞ্চন মনে আসা মাত্র যে উন্মাদনা, যে পুলক তার প্রতি লোমকূপে সে অনুভব করছে তা প্রেম। বিনীতা সেদিন মনে মনে মহাকাঞ্চনকে পতিরূপে বরণ করল। স্থির করল সুযোগ পেলে কোনও এক সময়ে পিতাকে তার মনের কথা বলবে।

পরদিন প্রভাত না হ'তেই বিনীতা সন্ধ্যাগমের জন্য ব্যাকুল হতে থাকল। আজ সে একাকিনী তার দয়িত সকাশে যাবে। তার শয়নকক্ষের গবাক্ষ থেকে অনবরত সূর্যের গতি লক্ষ করতে লাগল। তার মনে হ'ল সূর্যদেব আজ সব জেনেশুনেই তাঁর গতি শিথিল করেছেন। অতিমাত্র উৎকণ্ঠায় আজ তার আহারেও রুচি হ'ল না। অবশেষে ক্লান্তিতে সে সেই গবাক্ষের ধারেই মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়ল। এক সময়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখল সূর্য কখন পশ্চিম গগনে ঢলে পড়েছেন, অস্ত যেতে অধিক বিলম্ব নেই।

অতি উদ্বেগে দিশাহারা হয়ে বিনীতা পরিচারিকাকে ডাকতে লাগল। সে এলে তার সাহায্যে প্রসাধন করতে লাগল, কিন্তু অতি সত্বরতার জন্য পদে পদ ভুল হ'তে লাগল, ফলে আরও বিলম্ব হ'তে লাগল। পেটিকা থেকে উৎকৃষ্ট সুক্ষ্ম ঝিননিবাস বার করে পরিধান ক'রে পাদ-তট লাক্ষারসে রঞ্জিত করার জন্য পরিচারিকার দিকে বাড়িয়ে দিলে এবং স্বয়ং সেই অবসরে নয়নে অঞ্জন লাগাতে লাগল। কিন্তু অতি ব্যস্ততায় কিছু অঞ্জন তার গণ্ডদেশে লেগে গেল। সেই অঞ্জন মুছতে গিয়ে বিনীতার অযত্নপিনদ্ধ কঞ্চুলিকা শিথিল হয়ে বক্ষের যুগল লাবণ্যপুঞ্জ সহসা উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে প্রস্তুত হয়ে সে একাকিনী যাত্রা করল। যখন সে নদী-পুলিনে গিয়ে পৌঁছাল-তখন মহাকাঞ্চন স্নানান্তে অস্তায়মান সূর্যের দিকে চেয়ে প্রণাম করছে।

বিনীতা আজ দূর থেকে ফিরে যাবার জন্য আসে নি, অভিসারচিন্তা করেই এসেছে। সে নদীতীর থেকে নেমে স্রোতোধারার নিকট পর্যন্ত গেল এবং হঠাৎ উপলখণ্ডে পদস্খলনের অভিনয় করল। শব্দ শুনে মহাকাঞ্চন পশ্চাতে চেয়ে দেখল যুবতী নদী মধ্যে। সে ঝটিতি গিয়ে বিনীতার হাত ধ'রে তুলে ধীরে কূলে নিয়ে এল। বিনীতার

Digitized by srujan ka@gmail.com

সর্বাঙ্গে অপূর্ব শিহরণ সঞ্চারিত হ'ল। সে আবেগবিহ্বল হয়ে মহাকাঞ্চনের বক্ষে পতিত হ'ল। এই আকস্মিক রমণীসান্নিধ্যে মহাকাঞ্চন কিয়ৎক্ষণ বিবশ থেকে তারপর তার সমস্ত আত্মসংযম দ্বারা নিজের উপর কর্তৃত্ব ফিরে পেয়ে ধীরে আপনাকে মুক্ত করে নীরবে চ'লে গেল।

এই প্রত্যাখ্যানে বিনীতা অভিমানবিক্ষুব্ধা না হয়ে তাকে সাময়িক পরাজয় জ্ঞান করে পরদিন আবার নদীতীরে গেল। কিন্তু মহাকাঞ্চনকে কোথাও দেখতে পেল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তবু তার দেখা না পেয়ে বিমর্ষ চিত্তে সে প্রাসাদে ফিরে এল। পরিচারিকাকে বলল সোমদত্তের কোনও প্রতিবেশীর নিকট সন্ধান নিতে মহাকাঞ্চন শারীরিক সুস্থ আছেন কি না। পরিচারিকা সন্ধান নিয়ে এসে বিনীতাকে জানাল যে মহাকাঞ্চন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। এ কথা শুনে নানা সন্দেহে সংশয়ে বিনীতা বিনিদ্র রজনী যাপন করল। পরদিন সন্ধ্যায়ও চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ও বহুক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও বিনীতা মহাকাঞ্চনকে দেখতে পেল না। এই ভাবে তিনটি সন্ধ্যা ব্যর্থ হ'লে পর পরিচারিকা সংবাদ আনল যে মহাকাঞ্চন আজকাল নদীর অন্য কোনও ঘাটে স্নান করছেন।

বিনীতা মর্মাহতা হ'ল। এবার তার অন্তর অভিমানে পূর্ণ হ'ল। পরাজয়ের গ্লানিও অধিক হ'ল। পরদিন সে মনে মনে শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। সন্ধ্যায় যথাসাধ্য মোহিনী বেশ প'রে সে নদীতীরে বহুদূর পর্যন্ত বিচরণ ক'রে এক স্থানে স্নানরত মহাকাঞ্চনকে দেখতে পেল। এবার সে স্নানান্তে তীরে ওঠার ঘাটে অপেক্ষা ক'রে রইল। স্নান শেষে মহাকাঞ্চন তীরে উঠে এসে বিনীতাকে দেখেও না দেখে চ'লে যায় এমন সময়ে বিনীতা তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। মহাকাঞ্চন কুণ্ঠিত বিস্ময়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করতেই বিনীতা আপন কণ্ঠের পুষ্পমাল্য উন্মোচন ক'রে বলল, প্রিয়তম, এ মালা আজ আমি তোমার কণ্ঠে পরাব!

মহাকাঞ্চন দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল,—দেবী, আমি যোগী, পুষ্পমাল্যে আমার প্রয়োজন নেই। আমি কাল সুখিপল্লী ত্যাগ করে পাটলিপুত্রে মহর্ষি পতঞ্জলির নিকট যোগ শিক্ষার জন্য যাত্রা করব। এই মালা তুমি অন্য কারও জন্য রক্ষা কর, আমি এর যোগ্য পাত্র নই।

এই অপ্রত্যাশিত কঠিন বাক্যে বিনীতার হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল। তার হাত থেকে মালা ভূতলে পড়ল। সে কাষ্ঠপুত্তলীবৎ দাঁড়িয়ে রইল। মহাকাঞ্চন নতনেত্রে চলে গেল। কয় মুহূর্ত নিশ্চল থেকে তারপর বিনীতা ফুলের মালাটি কুড়িয়ে তুলে দেখল তা মহাকাঞ্চনের কাষ্ঠপাদুকায় দলিত। মালাখানি সে বক্ষে চেপে ধরে অনেকক্ষণ নীরবে অশ্রুপাত করল। অবশেষে ধীরে ধীরে প্রাসাদে ফিরে এল।

সেদিন রাত্রে বিনীতা জ্বরে প্রায় সংজ্ঞাহীন হ'ল। সুভদ্রদেব অতিশয় উদ্‌বিগ্ন

Digitized by srujan ka@gmail.com

হয়ে রাজবৈদ্যকে সংবাদ পাঠালেন। বৈদ্য এসে বহুক্ষণ পরীক্ষার পর নিদান দিলেন— এ রোগের নাম শালক্য, শলাকাবৎ অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তাতে বাত ও পিত্ত উভয় কুপিত হয়েছে। হঠাৎ কোনও প্রকার চিত্তপীড়ায় এঁর মস্তুলঙ্গ (মস্তিষ্ক) বিপর্যস্ত হয়েছে, ফলে জ্বরবিকার দেখা দিয়েছে। যাইহোক, এ সন্নিপাত নয়। এই বলে প্রতিকারার্থ প্রলেপের জন্য বিশেষ তৈল ও বাহুতে ধারণের জন্য কবচ দিয়ে বৈদ্যরাজ প্রস্থান করলেন। কিন্তু এ সবই বিফল হ'ল, বিনীতার অবস্থার ক্রমেই অবনতি হ'তে থাকল। বৈদ্যের চিকিৎসার সঙ্গে বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রার্থনা, অবশেষে ব্রাহ্মণ সোমদত্তের শান্তিস্বস্ত্যয়ন ও দেবপূজা সব সত্ত্বেও বিনীতার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হ'তে লাগল।

দীর্ঘ তিন মাস কাল এইভাবে অতিবাহিত হবার পর বিনীতার অন্তরের দুঃখ জ্বালা ক্রমে আপনি উপশম হ'তে লাগল এবং শরীরও সুস্থ হতে লাগল। ক্রমে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবার পর বিনীতা এক দিন পিতাকে বলল সে বিবাহ না করে সঙ্ঘে প্রবেশ করে আজীবন ভিক্ষুণী ব্রত পালন করতে চায়।

সুভদ্রদেব কন্যার কথায় বজ্রাহতবৎ নিশ্চল হ'য়ে রইলেন। কন্যাকে কলিঙ্গের যুবরাণী দেখবার তাঁর বহুদিন লালিত স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল। তিনি জানতেন তাঁর কন্যা যা একবার বলে কিছুতেই তার অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়।

কিছুদিন পরে বিনীতা বৌদ্ধবিহার থেকে সিদ্ধাচার্য ধর্মপালকে সংবাদ দিয়ে প্রাসাদে এনে তাঁর কাছে তার সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করল। স্বয়ং প্রাদেশিকের কন্যাকে তিনি ভিক্ষুণী ব্রতে দীক্ষিত করতে পারবেন জেনে ধর্মপাল যার পর নাই আহ্লাদিত হলেন। তাঁর সঙ্ঘের ভুসম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য তাঁর বহুদিনের ইচ্ছা পূরণ করবার সুযোগ হয়তো এবার তিনি পাবেন। নিরুপায় সুভদ্রদেব ধর্মপালকে যথা কর্তব্য করবার অনুমতি দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চ'লে গেলেন।

পরদিনই বিনীতা ধর্মপালের নিকট ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণের জন্য গেল। বিহার-প্রাঙ্গণে বহুমূল্য সুদৃশ্য চন্দ্রাতপ আলম্বিত হ'ল। সঙ্ঘের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ সকলে চন্দ্রাতপতলে সমবেত হ'ল। বিনীতা অতি সাধারণ বস্ত্র প'রে হাতে ভিক্ষুণীর পীত বসন নিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'ল। রীতি অনুযায়ী এক ভিক্ষু বিনীতাকে সিদ্ধাচার্য ও ভিক্ষু ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ের সহিত পরিচয় করিয়ে দিল। অতঃপর বিনীতা তিনবার বলল,—'অনুগ্রহপূর্বক আমায় ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণের অনুমতি প্রদান করুন, আমি নির্বাণার্থী।' তখন সিদ্ধাচার্য ধর্মপাল বিনীতার হাত হ'তে পীতবসন নিয়ে তার দ্বারা তার সর্বাঙ্গ আবৃত করে দিলেন। বিনীতা নতজানু হয়ে বসে আবৃত্তি করল,—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি

Digitized by srujan ka@gmail.com

বিহার-প্রাঙ্গণে গভীর নিনাদে ঘণ্টাধ্বনি হ'তে লাগল। সিদ্ধাচার্য তাঁর উপদেশে বললেন,—ধর্ম প্রজ্ঞা বটেন, বুদ্ধ পারমিতা এবং সঙ্ঘ মহাসুখ। প্রজ্ঞা স্ত্রী, পারমিতা পুরুষ, উভয়ের মিলনে মহাসুখ।

সেই অবধি বিনীতা ধর্মপালের সঙ্ঘভুক্ত হয়ে বিহারে থেকে ভিক্ষুণী ব্রত পালন করতে লাগল। কিন্তু তার মনে যে অগ্নি অনুক্ষণ জ্বলছিল বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা তা নির্বাপিত হ'ল না, বরং তীব্রতর হ'ল। বিনীতা মহাকাঞ্চনকে ভুলতে পারল না। সঙ্ঘের বজ্রগুরুর ধ্যান না করে সে মহাকাঞ্চনেরই ধ্যান করতে লাগল। তার ফেনিলোচ্ছল যৌবনবাসনাস্রোত বাধা পেয়ে স্ফীত, বিক্ষুব্ধ হ'ল।

অবশেষে বিহার বিনীতার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। আবাল্য সে কখনও অন্যের আদিষ্ট নিয়ম মেনে চলেনি, এখন বিহারের প্রত্যেক নিয়ম সে পদে পদে লঙ্ঘন করতে লাগল। উপরন্তু বৌদ্ধ বজ্রযানের গুহ্য দীক্ষা এমনই যে তাতে তার গোপন লিপ্সার লেলিহান জিহ্বাকে সমধিক উদ্রিক্ত করতে লাগল। 'পঞ্চকাশান্ পরিত্যজ্য তপোত্তৈনেব পীড়য়েৎ। সুখেন সাধয়েৎ বোধিঃ যোগতন্ত্রানুসারতঃ।।'—পঞ্চপ্রকার ভোগেচ্ছা ত্যাগ ক'রে আপনাকে পীড়া দিও না, যোগতন্ত্র অনুসারে সেই সুখভোগ করতে করতে সাধনা কর।—বজ্রতন্ত্রের এই সকল গূঢ় তত্ত্ব সিদ্ধাচার্য যতই বিশদ ক'রে বোঝাতে লাগলেন বিনীতার নিরুদ্ধ কামনা তাকে ততই পীড়া দিতে লাগল। বজ্রগুরুর আরাধনা না করে সে নিজ নিভৃত প্রকোষ্ঠে অন্য এক মূর্তি স্থাপন করে গোপনে তার আরাধনা করতে লাগল।

বিনীতার এই অনিয়ত গোপন ব্যাপারের কথা জানতে পেরে সিদ্ধাচার্য তাকে ভর্ৎসনা করলেন। বিনীতা সেই দিনই বিহার ত্যাগ ক'রে পিতার প্রাসাদে ফিরে এল। পিতাকে ব'লে প্রাসাদের প্রশস্ত উদ্যানে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়ে সেখানে সে এক গুহ্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করল। কন্যা সংসার ত্যাগ ক'রেও অন্ততঃ তাঁর নয়নগোচরে থাকবে ভেবে সুভদ্রদেব অন্তরে প্রীতিলাভ করলেন বে[illegible]ও আপত্তি তুললেন না।

নিজের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে বিনীতা তার আপন আরাধ্য মূর্তি গুপ্তভাবে রক্ষা ক'রে তার পূজা করতে লাগল। ক্রমে আর কোনো কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বিনীতার এই গুহ্য বৌদ্ধ সমাজে যোগ দিল। তারাও তাদের আপন আপন আরাধ্য মূর্তি—যা শঙ্কর ব'লে কথিত—সেই মন্দিরে গুহ্যভাবে রেখে তার পূজা করতে লাগল। সেগুলি প্রায়শঃ কোনও উদ্ভট কামকুটিল মূর্তি

বিনীতা ভিক্ষুণী ব্রত ধারণ করা অবধি বহু বৎসর কেটে গেছে। এতকাল পরে মহাকাঞ্চন পিতামাতার দর্শনাভিলাষী হয়ে সুখিপল্লীতে এসেছে, মহাশালও সঙ্গে এসেছে—এ সংবাদ গুহ্যকসমাজ প্রতিষ্ঠাত্রীর অগোচর নেই। এই সময়ে বিনীতা

Digitized by srujan ka@gmail.com

চম্পার ভগবদ্দর্শনের অদ্ভুত কাহিনী শুনতে পেল। তাই নিয়ে চিন্তা করতে করতে একটি অভিনব চিন্তা তার মনে এল। সে ভাবল,—চম্পা যাঁর বালক মূর্তি দেখেছে তিনি আমার এই গুহ্যকসমাজের ভগবান 'তথাগত গুহ্যক' বলে আমি যদি প্রমাণ করতে পারি তবে আমার এই সমাজ সম্যক্ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। বিনীতা চিরকাল আশুকারী। এ কথা মনে হওয়া মাত্র সে উঠে মহাকাঞ্চনকে একটি পত্র লিখে তার সমাজমন্দির একবার পরিদর্শন করে যেতে আমন্ত্রণ জানাল।

॥ ১১ ॥

বিনীতার পত্র পেয়ে মহাকাঞ্চন বিস্ময়াবিষ্ট হ'ল। বিনীতার প্রেম নিবেদন ও মহাকাঞ্চনের প্রত্যাখ্যান—সে সব বারো বৎসর পূর্বের কথা, লোকগণনায় যে কালখণ্ডকে এক যুগ বলা হয়। এত কাল পরে বিনীতা কি এখনও তার প্রেম প্রত্যাশী? বিনীতার ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণের কথা সে শুনেছিল। সে নিজেও এ যাবৎ দারপরিগ্রহ করেনি—তা যে কারণেই হোক। হয়তো তার জীবনে ধর্ম ও রাজনীতির যুগপৎ প্রবেশের কারণেই। বিনীতাকে প্রত্যাখ্যান করে থাকলেও তার সুতীব্র কামনাজড়িত প্রেম তার কৌমার অন্তরে প্রবল রেখাপাত করেছিল। তাই পরস্পরবিরুদ্ধ চিন্তায় সে আন্দোলিত হ'ল এবং অবশেষে বিনীতার আমন্ত্রণ স্বীকার ক'রে বাহকহস্তে পত্রের উত্তর পাঠাল।

পরদিন পূর্বাহ্নে মহাকাঞ্চন বিনীতার সমাজমন্দিরে উপস্থিত হ'ল। সে এসে সমাজের প্রতীক্ষা গৃহে উপবেশন মাত্র জনৈকা ভিক্ষুণী এসে বলল, —দেবী আপনার সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করবেন, আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।

মহাকাঞ্চনের ভ্রূযুগল মুহূর্তের জন্য ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল। কিন্তু সে ভিক্ষুণীর অনুগমন করল। ভিক্ষুণী তাকে বিনীতার একান্ত প্রকোষ্ঠ নির্দেশ করে দিয়ে অপসৃত হ'ল। মহাকাঞ্চন সেখানে প্রবেশ করে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট হ'ল।

বিনীতা অন্তরের চঞ্চলতা দমন করে স্মিত হেসে বলল,—আমার আশা ছিল আপনি একদিন আমার এই সমাজে পদার্পণ করবেন, কারণ আমি এখন ভিক্ষুণী ব্রতধারিণী, আমা থেকে এখন কারও সাধনপথে অন্তরায় ঘটার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আপনাকে ক্লেশ দিয়ে এখানে আমন্ত্রণ করেছি, সে জন্য আমায় ক্ষমা করবেন।

বিনীতার প্রেমপ্রার্থনা যেন গত কল্যের কথা!

মহাকাঞ্চনও সেই এক যুগ পূর্বের দিনটির মতই উদাসীন নত দৃষ্টিতে বলল,—অনাবশ্যক বাক্য পরিহার করে অনুগ্রহপূর্বক তোমার বক্তব্য প্রকাশ কর।

বিনীতা তার বক্তব্য বলতে গিয়েও বলতে পারল না। হঠাৎ উদ্বেলিত আবেগে তার বাক্‌রোধ হ'ল। অশ্রুপ্লুত চক্ষে সে কেবল মহাকাঞ্চনের দিকে চেয়ে রইল।

Digitized by srujan ka@gmail.com

মহাকাঞ্চন পূর্ববৎ বসে রইল।

কয়েকটি নীরব প্রখর মুহূর্ত কেটে গেল। মহাকাঞ্চন কিঞ্চিৎ অধীরভাবে নীরবতা ভঙ্গ করে বলল,—তোমার পত্রে অবগত হলাম কোনও গুরুতর কার্যে তুমি আমার সাহায্যপ্রার্থিনী। অনুগ্রহ করে অগৌণে সে বিষয়ে বিশদ ব'লে আমায় কৃতার্থ কর।

বিনীতা অসীম বলে আপন কতৃত্ব ফিরে পেয়ে সহজ কণ্ঠে বলল,—তার পূর্বে আপনাকে আমার অভিনন্দন জানাই। মগধরাজ ও কলিঙ্গরাজের মধ্যে যে সর্বাংশে লোকহিতকর সন্ধি স্থাপিত হয়েছে সে কেবল আপনার মত মহাযোগীর যোগবলেই সম্ভব হয়েছে। আমি—

মহাকাঞ্চন হস্তোত্তলন করে বাধা দিয়ে বলল,—ক্ষমা কর, দেবী। আমি আত্ম-প্রশংসা শোনবার জন্য এখানে আসিনি। তোমার বক্তব্যটি শুনলেই অধিক প্রীত হব।

—আপনি বিনয়ী। প্রশংসা ক'রে যদি আপনার বিনয় বিচলিত ক'রে থাকি ক্ষমা করবেন। প্রকৃতপক্ষে আপনার যোগবল বিষয়ক কোনও কথা বলবার জন্যই আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। এবার বলি, সুখিপল্লীর বালিকা চম্পার কাহিনী বোধ হয় আপনার অবিদিত নয়?

—তার স্বপ্নের কথা আমি শুনেছি। চম্পা নির্বোধ বালিকা, তার কাহিনীকে কোনও গুরুত্ব দেওয়া অনুচিত মনে করি।

—চম্পা নির্বোধ নয়, সরলা। কোনও নির্বোধ অথবা ধূর্ত বালিকার পক্ষে এ প্রকার মিথ্যা এত বিশদভাবে বলা সম্ভব নয়। তার কাহিনীর মধ্যে আদ্যন্ত এক সঙ্গতি আছে। আমার বিশ্বাস আপনি তাকে আদেশ দিলে সে চলৎশক্তি ফিরে পাবে।

মহাকাঞ্চন হঠাৎ ব্যথাতুর কণ্ঠে বলে উঠল,—দেবী, আমার কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নেই। আমি নিশ্চয় পাপী, নচেৎ আজ আমার মহামন্ত্রিত্ব সত্ত্বেও মগধের এই পরাজয় হ'ত না, ধর্মের পরাজয় হ'ত না।

—কিন্তু সুখিপল্লীতে আপনার সম্বন্ধে ধারণা অন্যরূপ! সুখিপল্লীর লোকে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা বলে চম্পার নিরাময় দেখবার জন্য বসে আছে। মগধের পরাজয়কে হয়তো আপাত দৃষ্টিতে ধর্মের পরাজয় বলে আপনার প্রতীতি হচ্ছে। আপনার প্রকৃত ধর্মবল সুখিপল্লীতে প্রমাণিত হবে।

মহাকাঞ্চন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—আজ এখানে আসবার সময়ে পথে কত পল্লীবাসী আমায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করেছে। তাই দেখে আমি অনুভব করছি এই লোকধারণা কতদূর অগ্রসর হয়েছে। লোকে ধর্ম পালন করতে উৎসাহী নয়, তারা অন্যের অলৌকিক শক্তি দেখতে চায়—তার সাহায্যে আপন সাংসারিক উন্নতি সাধনের আশায়। আমি ভেবেছি, এই কথা সমস্ত পল্লীবাসীদের বুঝিয়ে বলব। আশা করি সকলে বুঝবে।

Digitized by srujan ka@gmail.com

বিনীতা ঈষৎ হেসে বলল,—আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। সাধারণ লোকের মনের কথা হয়তো আপনি সমস্তটা জানেন না। আপনি লোকসমক্ষে যতই যুক্তিযুক্ত কথা বলুন তাদের অলৌকিক ক্রিয়া দেখবার কৌতূহল চরিতার্থ না করলে তারা কেবল আপনার উপর ভক্তি হারাবে না, আপনাকে অবজ্ঞার পাত্র জ্ঞান করবে।

মহাকাঞ্চন বিনীতার সূক্ষ্ম মন্তব্যে বিস্মিত হ'ল, কিন্তু নীরব রইল। বিনীতা আবার বলল,—যদি অন্যরূপ মনে না করেন আমি আপনাকে একটি পরামর্শ দেব এই নিবেদন।

—আমি আগ্রহী। এ ব্যাপারে আমি এক প্রকার অসহায় বোধ করছি।

—চম্পার ঘটনা আমি লোকমুখে শুনেছি মাত্র, এ যাবৎ তাকে সাক্ষাতে দেখিনি। আপনি কি দেখেছেন?

—না।

—তাহ'লে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে স্বয়ং চম্পার মুখ থেকে সমস্ত ঘটনাটি শোনা বোধ করি শ্রেয়ঃ।

—অবশ্য।

—তাহলে আমার প্রস্তাব আমি চম্পাকে কাল এইখানে আসতে ব'লে আজই সংবাদ পাঠাব। আপনি দয়া করে আমার একটি অনুরোধ রাখলে আমি কৃতার্থ হব—আপনি কাল আর একটিবার এখানে এসে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

—কেন, দেবী?

—কারণ, এতে আমায় কিঞ্চিৎ স্বার্থ আছে।........তুমি তো জানো......তুমি তো জানো.......

হঠাৎ এক দুর্নিবার আকুলতায় বিনীতার কণ্ঠরোধ হ'ল। উদ্‌গত অশ্রু সংবরণ করতে না পেরে সে অধোবদনে দাঁড়িয়ে রইল। দুই বিন্দু অশ্রু কোনও বাধা না মেনে মহাকাঞ্চনের পায়ে পড়ল। মহাকাঞ্চন চকিত হয়ে মাথা তুলে বিনীতার মুখপানে চেয়ে স্তম্ভিত হ'ল। যুগসঞ্চিত এক অজ্ঞাত ব্যথায় আজ তারও হৃদয় মথিত হ'ল।

বিনীতা বহু কষ্টে আত্মসংবরণ করে বলল,—তুমি তো জানো আমি বিবাহিতা।

—বিবাহিতা!!

—হাঁ। সেদিন যে মালা তোমার কণ্ঠে পরাতে গিয়েছিলাম তা কি আগেই আমার অন্তর তোমায় পরায়নি?

মহাকাঞ্চন রুদ্ধবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। বিনীতা প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে এক রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে বলল,—তাই তো এই সমাজ আজ আমার গৃহ, এই মূর্তি আমার—আমার দেবতা।

সে মূর্তি দেখে মহাকাঞ্চন চমকে উঠল। এ যে তারই প্রতিমূর্তি! তার কণ্ঠদেশে

Digitized by srujan ka@gmail.com

সেই পুষ্পহার যা বিনীতা সেদিন তারই কণ্ঠে অর্পণ করতে গিয়েছিল।

মহাকাঞ্চন এক অপূর্ব বেদনা অনুভব করল।

॥ ১২ ॥

পরদিন মহাকাঞ্চন পুনরায় প্রাদেশিকের প্রাসাদভূমিতে বিনীতার সমাজে উপস্থিত হ'ল। বিনীতা তৎপূর্বেই চম্পাকে সেখানে আনিয়েছিল। এখন মহাকাঞ্চনকে দেখে চম্পা আসাযষ্টি ধরে উঠে দাঁড়াল। মহাযোগীকে দেখে ভয় ও আশার উত্তেজনায় সে কম্পমান হ'ল। বিনীতা দাঁড়িয়ে উঠে চম্পাকে ধরল।

মহাকাঞ্চন চম্পার মস্তক স্পর্শ করে বলল,—মা, ভয় পেও না। কি হয়েছিল সব খুলে বল তো, মা।

চম্পা আদ্যোপান্ত সমস্ত বলে গেল। লোককে ব'লে ব'লে তার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। অতি অভ্যাসের ফলে আজকাল তার মাঝে মাঝে মনে হয় এ সব কি সত্যই ঘটেছিল না বাল্যাবধি কোনও বহুশ্রুত কাহিনী সে সবাইকে ব'লে যাচ্ছে? তার সরল মুখচ্ছবির দিকে চেয়ে মহাকাঞ্চনের মনে হ'ল এ চম্পার ভ্রম হ'তে পারে কিন্তু ছলনা আদৌ নয়। সে চিন্তা করতে লাগল। যদি এ আহ্বান সে গ্রহণ না করে লোকে ভাববে এ ভীরু, ভণ্ড তপস্বী—যেহেতু আগে হ'তে তার ধার্মিক যোগী ব'লে, খ্যাতি রয়েছে। বেচারী চম্পা হয়তো তা ভাববে না, সে কেবল ভাববে—আমি সামান্য, মূর্খ বালিকা ব'লে মহাযোগী আমায় তাচ্ছিল্য করলেন, আমি তাঁর যোগবল প্রকাশের যোগ্য পাত্রী নই। অপর পক্ষে চম্পা যা বলছে তা যদি প্রকৃতই ঘটে থাকে, যদি সত্যই ভগবান আমার প্রতি নির্দেশ করে থাকেন, তা হ'লে এই আদেশ-অনুষ্ঠান দ্বারা আমার চির অভিলষিত উদ্দেশ্য সাধিত হবে, পিতার আদৃত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ হবে। ব্রাহ্মণ মগধরাজ স্বয়ং পরাজিত হয়ে থাকলেও শেষ ও চূড়ান্ত জয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই হবে। মহাকাঞ্চনের মনে হ'ল ভগবান এই ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে তাকে এক গূঢ় ইঙ্গিত দিচ্ছেন। কিন্তু—কিন্তু—যদি এ অসম্ভব সম্ভব না হয়?

মহাকাঞ্চন মহা দ্বিধায় পড়ল। বিনীতা তা লক্ষ করল। মহাকাঞ্চনকে ভাববার সময় দিয়ে সে কিছুক্ষণের জন্য কক্ষান্তরে গেল। মহাকাঞ্চন অধীর ভাবে পাদচারণা করতে করতে একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আকুল প্রার্থনার স্বরে বলল,—হে করুণাময়, আমায় স্পষ্ট নির্দেশ দাও, আমি যে অক্ষম দুর্বল অনুভব করছি। প্রার্থনার কাতরতায় তার গণ্ডদেশ অশ্রুপ্লাবিত হ'ল, কিন্তু তার অন্তরে কোনও আলোকপাত হ'ল না, তার সংশয়ও গেল না।

মহাকাঞ্চন দুর্বলচেতা নয়। সে স্থির করল, নিশ্চিত নির্দেশ যখন পাওয়া গেল

Digitized by srujan ka@gmail.com

না তখন কেবল আত্মশক্তির উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে, ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে। সেইখানে যোগাসনে ব'সে সে ধ্যানস্থ হ'ল। চম্পা নীরবে বসেছিল, মহাকাঞ্চনকে ধ্যানস্থ হতে দেখে সে কিংকর্তব্য স্থির করতে পারছিল না। মহাযোগী কি তাহলে তাকে আদেশ দেবেন না? সে কি তাহলে এখানে আর অপেক্ষা না করে গৃহে ফিরে যাবে? এমন সময়ে তার মনে হ'ল মহাকাঞ্চন যেন ধ্যানস্থ অবস্থাতেই ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বে উঠছেন! চক্ষু মার্জনা করে দেখল তিনি সম্পূর্ণ নিরালম্ব হয়ে শূন্যে অবস্থান করছেন, স্বল্পক্ষণ পরে ধীরে ধীরে অবতরণ করলেন। চম্পা মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে মহাকাঞ্চন আসন ত্যাগ করে উঠে চম্পাকে ওঠাল। চম্পাকে সাবধান করে দিয়ে বলল,—মা, এখানে যা দেখলে তা কাউকে বলোনা।

সেই সময়ে বিনীতা কক্ষান্তর থেকে ফিরে এল। মহাকাঞ্চন সুস্থিরভাবে তাকে বলল,—কাল আমি চম্পাকে আদেশ করব—তোমার এই মন্দিরচত্বরেই।

এ কথা শুনে চম্পা সানন্দে বিদায় নিল। ঘরে পৌঁছানো মাত্র তার মাকে সমস্ত কথা আনুপূর্বিক বর্ণনা করল, অতি উৎসাহে মহাকাঞ্চনের 'সাবধান' বাণী ভুলে গেল। চম্পার মা যার পর নাই আনন্দে এ সংবাদ সবিস্তারে এবং আপন অজ্ঞাতসারে কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জন সহকারে চতুর্দিকে প্রচার করে নিশ্চিন্ত হ'ল।

মধুকর এ কথা শুনে চিন্তিত হ'ল। সে স্বয়ং সুদক্ষ ঐন্দ্রজালিক। যোগবলে অলৌকিক ব্যাপার সংঘটনকে সে এক প্রকার ইন্দ্রজাল বলেই মনে করে। তার মতে চরম সত্য বা ভগবৎরহস্যের সঙ্গে এই অলৌকিক শক্তির কোনও সম্পর্ক নেই, এর দ্বারা জগতের কোনও উপকার সাধিত হয় না, একমাত্র সর্বজীবে প্রীতির সাধনা দ্বারাই তা সাধিত হতে পারে এবং ভগবান নামক চিরন্তন রহস্যের নিকটবর্তী হওয়া যেতে পারে। সে কেবল নীরবে বন্ধু মহাকাঞ্চনের সাফল্যের সম্ভাবনা কতখানি তাই চিন্তা করতে লাগল।

ওদিকে মহাকাঞ্চন গৃহে প্রত্যাগমন করে পুনরায় ধ্যানে বসল। কিন্তু শত চেষ্টাতেও আজ সে মনকে স্থির অচঞ্চল রাখতে পারল না। তার অন্তর আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পূর্ববৎ দোলায়মান হয়ে রইল।

॥ ১৩ ॥

পরদিন প্রভাত না হ'তে পল্লীবাসীরা প্রাদেশিকের প্রাসাদভূমিতে গিয়ে একত্রিত হ'ল। সেখানে একটি শমীবৃক্ষতলে মহাকাঞ্চনের জন্য বিনীতা একটি বেদী নির্মিত করিয়েছে। চম্পা তার আসাযষ্টি দুইখানিতে ভর ক'রে বেদীর নীচে এসে দাঁড়াল। বিনীতা স্বয়ং তার হাত ধরে দাঁড়াল। আজ বিনীতাকে বড়ই সুন্দর দেখচ্ছে। তার

Digitized by srujan ka@gmail.com

আনন্দোজ্জ্বল মুখের চারিপাশে যেন দেখা যায় এককমনীয় আভার পরিমণ্ডল! চম্পার উচ্চকিত মনোভাব ও সেইমত মুখভাব বর্ণনা করা সহজ নয়। স্থূলভাবে কেবল বলা যায় যে তার মনে ও মুখে বিশ্বাসের ভাবই প্রধান—আজ সে তার চলৎশক্তি ফিরে পাবে। সেই জন্য আনন্দ। আবার সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণে সন্দেহ-সংশয়, এবং সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ে উত্তেজনা ও কিঞ্চিৎ অজানা ভয়। পল্লীবাসীরা এক অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করবার উদগ্র আশায় অস্থির ও উৎফুল্লভাবে মহাকাঞ্চনের প্রতীক্ষারত।

দীর্ঘকায় মহাকাঞ্চনের তেজস্বী মুখচ্ছবি প্রাসাদ উদ্যানের প্রবেশদ্বারে দেখা যেতেই পল্লীবাসীরা জয়ধ্বনি করে উঠল। মহাকাঞ্চন কোনও দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে ধীর পদে এসে বেদীর উপরে উঠল। কিয়ৎক্ষণ মৌন থেকে সে উর্ধ্বমুখে প্রণাম করল। তারপর ধীর গভীরোদাত্ত কণ্ঠে চম্পার দিকে চেয়ে বলতে লাগল—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।

—যার কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দ স্বরূপ মাধবের বন্দনা করি।—তাঁরই নির্দেশে ব্রহ্মার চতুর্মুখ হ'তে চতুর্বেদ নির্গত হয়ে জগৎসংসারে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করেছে,— যে বেদ শ্রবণমাত্র সমস্ত পাপ অপগত হয়; সেই তাঁকেই কোটি নমস্কার করে আমি তোমকে আদেশ করছি তুমি তোমার যষ্টিদ্বয় ত্যাগ ক'রে স্বপাদে গমন কর।

স্তব্ধ জনতা রুদ্ধশ্বাসে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। চম্পা চূড়ান্ত উত্তেজনায় এক বার কেঁপে উঠে আসাযষ্টি দু'খানা ফেলে দিল, অত্যুজ্জ্বল নয়নে অন্ধদৃষ্টিতে আপন পায়ে চলবার চেষ্টা করল। কিন্তু এক পা অগ্রসর না হ'তেই আর্ত চিৎকার ক'রে ভূপতিত হ'ল।

চম্পাকে পড়ে যেতে দেখে জনতা প্রথমে কয় মুহূর্ত হতবুদ্ধি হয়ে রইল। তার পরে চম্পা বাস্তবিক চলৎশক্তি ফিরে পায়নি এ কথা হৃদয়ঙ্গম করে আশ্চর্য হয়ে মহাকাঞ্চনের দিকে তাকাল। ক্রমে জনতার মধ্য থেকে নানা মন্তব্যের অনুচ্চ গুঞ্জন ধ্বনি উত্থিত হ'ল এবং অচিরে তা কটু ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

বিনীতাও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি যে মহাকাঞ্চনের আদেশ ব্যর্থ হয়েছে, ভগবানের নির্দেশ এক ক্রূর পরিহাসে পরিণত হয়েছে। চম্পা কিন্তু তথাপি বলপূর্বক আবার উঠে চলবার চেষ্টা করল, কিন্তু আবার যন্ত্রণায় চিৎকার করে পড়ে গেল। বিনীতা আশাভঙ্গের দুঃখ ও তজ্জনিত তীব্র বিরক্তি নিয়ে চম্পার দিকে চাইল। তার পর মহাকাঞ্চনের দিকে চেয়ে দেখল তাঁর মুখে ব্যর্থতার কালিমা। মহাকাঞ্চনও বিনীতার দিকে অসহায় ব্যথিত দৃষ্টিতে এক বার চেয়ে সে স্থান ত্যাগ করল। সোমদত্ত

Digitized by srujan ka@gmail.com

ও কাত্যায়নীও প্রস্থান করলেন।

পল্লীবাসীরা নানা মন্তব্য করতে করতে নিজ নিজ গৃহে ফিরল। কোনও নাটকাভিনয় মধ্যপথে হঠাৎ স্থগিত হয়ে গেলে যে তিক্ততা অনুভব করা যায় সেইরূপ তিক্ততা নিয়ে তারা ঘরে ফিরল।

বিনীতা তার মন্দির প্রকোষ্ঠে গিয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল। এদিকে প্রাসাদভূমি জনশূন্য হয়ে যেতে চম্পাও ধীরে ধীরে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে তার আসাবাড়ি দুই গাছি কুড়িয়ে তার সাহায্যে উঠে দাঁড়াল। মা ও মধুকাকাকে দেখে সে অশান্তভাবে কাঁদতে লাগল। মধুকর তাকে অনেক আদর ক'রে সান্ত্বনা দিতে দিতে বাড়ী নিয়ে গেল।

॥ ১৪ ॥

সোমদত্ত ও কাত্যায়নী গৃহে ফিরে দেখলেন মহাকাঞ্চন বিমর্ষ চিত্তে বসে আছে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সোমদত্ত বললেন,—বৎস, আমার দৃঢ় বিশ্বাস চম্পা এতক্ষণে নিজের পায়ে চলতে পারছে। ভগবানের নির্দেশ সম্বন্ধে চম্পার ভ্রম হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু যোগের শক্তি মিথ্যা হ'তে পারে না। যোগবলে যে শূন্যে—

বাধা দিয়ে ব্যথিত স্বরে মহাকাঞ্চন ব'লে উঠল,—পিতা, ও কথা বলবেন না। শত চেষ্টাতেও যখন আমি ভগবানের নিশ্চিত নির্দেশ অন্তরে অনুভব করতে পারলাম না তখন স্থির করলাম চম্পার আপন বিশ্বাসের বলেই আমি অভীষ্ট লাভের চেষ্টা করব। তার স্বপ্নবৎ ভগবদ্দর্শনের ব্যাপারে আমার সম্বন্ধে তার দৃঢ় বিশ্বাস প্রথম থেকেই ছিল, সেই বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করবার জন্য আমি তাকে আমার হঠযোগের বলপ্রদর্শন করেছিলাম। পিতা, এ ব্যর্থতা আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। আজ আমার স্মরণে আসছে সেই অদ্ভুত পরিব্রাজকের কথা। সে বলেছিল, ঐন্দ্রজালিক নানা অলৌকিক ক্রীড়া প্রদর্শন করে, তাতে আমাদের মনোরঞ্জন হয় কিন্তু তার দ্বারা সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না।

মহাকাঞ্চন সহসা শিশুর ন্যায় কেঁদে উঠে ব্যাকুলভাবে হাত তুলে বলতে লাগল,—হে যুবক, হে যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী, হে সত্যান্বেষী, তুমি এস, ফিরে এস। নূতন আলোক দেখাও। ক্ষমা কর আমায়!

সোমদত্ত আশ্চর্য হয়ে বললেন,—যুবক! কে সে যুবক?

—পিতা, সে এক অদ্ভুত যুবক। মগধে আমি রাজগুরু হবার কিছুকাল পরের কথা। তখন গোরধগিরির যুদ্ধ আসন্ন। মহামন্ত্রী হিসাবে আমি যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত, এই সময়ে একদিন গুপ্তচরমুখে শুনতে পেলাম পাটলিপুত্রে এক অজ্ঞাতনামা যুবক এসেছে, তার অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে পাটলিপুত্রের যুবকেরা তার প্রতি আকৃষ্ট

Digitized by srujan ka@gmail.com

হয়ে তার ভক্ত হয়ে পড়ছে, কেউ বা তার শিষ্যত্বও গ্রহণ করছে। মনে হয় সে এখানকার যুবকদের এক নূতনতর শিক্ষা দিতে চায়। কিন্তু লোকশিক্ষা দেবার অধিকার কেবল রাজানুমোদিত শিক্ষকদের। বিশেষ গুপ্তচরমুখে অধিক এই শুনলাম যে সেই যুবকের বাক্য বেদবিরোধী। কিন্তু বৈদিক ধর্মের রক্ষার্থে আমি মগধে কঠোর নিয়মের প্রবর্তন করেছিলাম, সে নিয়ম অনুসারে বেদের অবমাননাকারীর শাস্তি মৃত্যু। তাই সে সংবাদের সত্যাসত্য জানবার জন্য আমি সেই যুবককে আমার সম্মুখে উপস্থিত করবার আজ্ঞা দিলাম।

যুবক এলে তার আকার প্রকার দেখে আমার বিস্ময় বোধ হ'ল। তার দেহের বর্ণ ঘনশ্যাম, অযত্নবর্ধিত দীর্ঘ কেশ, বেশবাসও পারিপাট্যহীন, কিন্তু তার উজ্জ্বল চক্ষু দুইটির চাহনি কেমন পৃথক্, অনন্যসাধারণ। সে চাহনিতে তীক্ষ্ণতা নেই, আছে কেবল যেন এক গভীর অনুসন্ধিৎসা, যেন সে চোখ বিশ্বসৃষ্টির প্রতি বিস্ময়ে বিস্ফারিত। অধরে সদা স্মিত হাসি। যুবক এসে অভিবাদন ক'রে উপবেশন করল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—যুবক, তোমার নাম কি? তোমার জন্ম কোন দেশে? তুমি কার পুত্র? কি উপায়ে জীবিকা নির্বাহ কর?

যুবক তেমনি স্মিত হেসেই বলল,—আমি অমৃতের সন্তান, আমার জন্ম এই বিরাট বিশাল বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে পৃথিবী নামক এই মৃৎকণিকায়। আমি চার্বাক নামে পরিচিত। আমার জীবিকানির্বাহ হয় ঋণং কৃত্বা।

আমি বললাম, তোমার নামের অর্থ চারু বাক্ যার, তুমি সুন্দর বাক্য বলবে। কিন্তু তোমার বাক্য বেদবিরোধী, সে জন্য তুমি দুষ্টবাক্ এবং দণ্ডনীয়। উপরন্তু জীবিকানির্বাহের নিমিত্ত তুমি সাধু পন্থা অবলম্বন কর না, সে জন্যও তুমি দণ্ডনীয়।

—রাজগুরু মহাশয়, আপনি আমার কথার উচিত অর্থ করলেন না। আমি বলছিলাম যে আমার এই দেহ যে অন্নে বর্ধিত ও পরিপুষ্ট সে অন্ন উৎপন্ন করার জন্য মনুষ্যসমাজের সকলেই সকলের কাছে ঋণী। অর্থের বিনিময়ে তা ক্রয় করলেও তার ঋণ পরিশোধ হয় না। কৃষক বহু যত্ন করে ধান উৎপন্ন না করলে আপনি লক্ষ মুদ্রা দিয়েও তা পেতেন না। আবার আপনি এবং সমাজ সে অন্ন নেবেন এ কথা নিশ্চিত জেনেই কৃষক এত কষ্ট স্বীকার করে, কেউ তা না নিলে অত অন্ন নিয়ে সে কি করত? সকলে তার ধান কিনছে বলে সে জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু পাচ্ছে। এই রকম বস্ত্র উৎপাদক তন্তুবায়ও। কাজেই কেউ যদি ঋণী নয় ব'লে দাবি করে তবে সে হয় মূঢ় নয় প্রবঞ্চক। কেউ যদি তার উপার্জিত অন্নবস্ত্রের জন্য সমাজকে উপেক্ষা ক'রে কেবল ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানায় তবে সে দাম্ভিক। সমাজে তার স্থিতি সমাজের পক্ষে অমঙ্গলজনক। সকলে যদি নিজেকে অন্য সকলের নিকট ঋণী বলে মনে করে তবে সকলেই ঘৃত পান করতে পাবে।

Digitized by srujan ka@gmail.com

আর, আমার নাম সম্বন্ধে বলতে হয় আমার নামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। যে নামেই আমায় সম্বোধন করুন আমার আপত্তি নেই, দুঃখও নেই। আমার বেদবিরোধী প্রচার সম্বন্ধে আপনি যা বলছিলেন সে বিষয়ে আমি কেবল বলব যে যুগে যুগে মানব মনের চিরন্তন ন্যায়বুদ্ধির কারণে নূতন চিন্তাধারার উদ্ভব হয়। তখন পুরাতন চিন্তাধারার অন্যায় সুবিধাভোগী সম্প্রদায় সেই সুবিধা হারাবার ভয়ে নূতন চিন্তাধারাকে অধর্ম পাপ রাজদ্রোহ প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে বাধা দেয়, নিষ্ঠুরভাবে দমন করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। আমার মনে হয় পরম্পরাগত চিরাচরিত প্রথার ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ ক'রে মানব অন্তরের যে মৌলিক ধর্ম—তার জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান—তাকেই অবলম্বন করা এবং নূতন ক'রে উত্তর খোঁজার সময় উপস্থিত। সকলে বেদের কর্মকাণ্ডের নিয়মাচরণ দ্বারা পাশবদ্ধ পশুর মত ভীত। প্রকৃত মানুষের মত অহং-এর গণ্ডি পার হয়ে—

আমি বিরক্ত হয়ে বাধা দিয়ে বললাম,—শাসননীতি সম্বন্ধে আমি তোমার মত অর্বাচীনের কাছে উপদেশ শুনতে চাই না। সমস্ত সাধারণ লোক যদি তোমার মত রাজনীতি চর্চা শুরু করে তবে তা দেশ শাসনের পক্ষে একান্ত ক্ষতিকর হবে। রাজনীতি কেবল রাজা ও তাঁর মন্ত্রিবর্গের আচরণীয় ও আলোচ্য বিষয়। সাধারণ লোকের কর্তব্য কেবল রাজানুশাসন পালন করা।

চার্বাক তথাপি বলল,—মহাশয়, সাধারণ লোক চিরকাল এমনি নিমিত্তমাত্র হয়ে থাকে না। এক সময়ে সে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে, তখন সদুত্তর না পেলে রাজানুশাসনের প্রতি আস্থা হারায়, তার এই অনাস্থার বিষবাষ্প কালক্রমে বিদ্রোহের আকার নেয়। কিন্তু আলোচনার পথ উন্মুক্ত থাকলে তা ঘটতে পারে না।

চার্বাকের অকাট্য যুক্তিতে আমার ক্রোধ অধিক হ'ল। আমি তিক্ত স্বরে বললাম,—কোনও অর্বাচীনের সঙ্গে তর্ক করবার সময় আমার নেই। আমি কেবল জানতে চাই তুমি তোমার যুবক ভক্তদের বা শিষ্যদের বেদের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়েছ কি না।

চার্বাক বলল,—আমি তো কাকেও কিছু শিক্ষা দিই না, আমি কেবল আলোচনা করি। মানুষ নিজেই নিজেকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। অবশ্য তা বহু সময়সাপেক্ষ, কিন্তু তা স্থায়ী। অন্যে শিক্ষা দিতে গেলে মানুষের মনে স্বতঃ বিরুদ্ধভাব জাগ্রত হয়। আর, বেদ কেন, কোনও ধর্মের বিরুদ্ধেই আমি কাকেও কিছু বলি না। যে সত্যান্বেষী সে যে ধর্মেরই হোক আমার নমস্য।

—তাহলে তুমি বেদ স্বীকার কর?

—করি, যেমন সকলের সকল চিন্তাকেই স্বীকার করি। যেমন করি আপনার ও আমার অস্তিত্বকে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কোনও বিষয় বা বস্তুকে স্বীকার করা

Digitized by srujan ka@gmail.com

এক কথা, চরম সত্য অন্য এক কথা।

—তাহলে তুমি বলতে চাও বেদে যা উক্ত হয়েছে তা সত্য নয়?

—তা আমি কি ক'রে বলব? রোমক দেশে দেখলাম কতক লোকের সত্যের অত্যাচারে অন্য কতক লোক উৎপীড়িত, ভীত, ত্রস্ত। হেলেন দেশে গিয়ে শুনলাম কতক লোক একদিকে যখন তাদের সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টিত ছিল অন্যদিকে তারা তখন সেই সত্যের যথার্থতা সন্ধানীদের হত্যা করেছিল, এমন কি শক্রতোষ ব'লে এক মহাসত্যান্বেষীকে নাকি তারা বিষ পানে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য করেছিল।

আমি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম। চার্বাক ব'লে চলল,—পালস্তিনে দেখলাম সেখানকার লোকে মনে করে তারা ঈশ্বরের আপন জন। সেখানেও এক অদ্ভুত যুবককে এক সত্য প্রচার করতে দেখলাম, তার নাম যশস্‌কৃষ্ণ। দেখলাম কতক লোকে বলছে সে নাকি ঈশ্বরের পুত্র। কিন্তু তাকে সাধারণ চৌর ও দস্যুদের সঙ্গেই অতি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদন্ড দেওয়া হ'ল। ভারতে আপনি বলছেন বেদই একমাত্র সত্য। বুদ্ধ প্রচার ক'রে গেলেন অন্য এক সত্য। বলুন, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

চার্বাক কত পর্যটন করেছে কত কি দেখেছে জেনেছে শুনে আমি হতবাক্ হলাম। সে আরও বলল,—সমস্ত দেখে শুনে আমার মনে এই ধারণা জন্মাচ্ছে যে সত্যপ্রচারকেরা মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে ব্যাকুল হয়ে বহু চিন্তা বহু আয়াসের পর মানুষের দুঃখকে এড়াবার যা সত্য পথ ব'লে মনে করেছেন তাই প্রচার করেছেন, এবং সেই সব সত্য বাহির থেকে দেখতে পরস্পর থেকে কিছু বিভিন্ন মনে হলেও অন্তরে প্রকৃতপক্ষে একই। কিন্তু তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যেরা কেবল বাহিরের সেই সামান্য প্রভেদগুলিকে নিয়ে নানা বিধি-বিধান তৈরি করেন এবং তার ফলে সেই বিধি-বিধানগুলিই ক্রমে মানুষের চোখে অত্যন্ত বড় হয়ে উঠে প্রকৃত ধর্ম বা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করে। সেই প্রভেদগুলিকে এমনি বড় করে তোলার পিছনে উদ্দেশ্য হ'ল আপন আপন গুরু বা মহাগুরুকে বড় ব'লে, সাক্ষাৎ ভগবান ব'লে প্রতিপন্ন করে সেই সূত্রে আপন প্রাধান্য বিস্তার করা। এর ফল এমনই বিষময় হয়েছে যে মানুষের ক্ষুব্ধ অন্তর যেন আজ আর্তস্বরে বলে উঠতে চায়—কোথায় তোমরা সেই মহাত্মারা যাদের হৃদয় কেঁদেছিল সকল কালের সকল মানুষের জন্য! হায়, তোমরা না এলেই বুঝি ভাল হ'ত। যদি এসেই ছিলে তবে আজ আর একবার এস, এস তোমরা একত্রে। দেখিয়ে দিয়ে যাও তোমাদের মধ্যে, তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রচারের মধ্যে ছিল না কোনও সত্যকার ভেদ। নইলে জীবনে যেমন আমাদের দশা দেখে কেঁদেছিলে মরণে তেমনই আমাদের ব্যবহার দেখে কাঁদবে অনন্তকাল।

সে থামলে আমি বললাম,—মানুষের মধ্যে স্বভাবতঃ দুষ্টবুদ্ধিই প্রবল। তার এই

Digitized by srujan ka@gmail.com

দুষ্টবুদ্ধি যদি দমন না করা হয় তাহলে পৃথিবীতে অশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। সেই জন্যই একনায়ক শাসন আবশ্যক।

—এইখানে আপনার সঙ্গে আমার মৌলিক পার্থক্য ঘটছে। আমার মনে হয় মানুষ চিরদিন সত্য-শিব-সুন্দরের উপাসক। কিন্তু মানুষের সম্বন্ধে আপনার ধারণাই যদি যথার্থ হয় তবে একনায়কত্বই আবশ্যক। কিন্তু তাহলে আপনার কিংবা আমার শাসন লোকে মেনে নেবেই বা কেন? কারণ আপনি-আমিও তো মনুষ্য মাত্র। পক্ষান্তরে যদি মানুষ সম্বন্ধে আমার ধারণা যথার্থ হয় তাহলে সমালোচনামূলক শাসনই ব্যবস্থাই শ্রেয়ঃ। এই জন্যই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বে এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া আবশ্যক। আমার ধারণা সব মানুষই বিনা পরিশ্রমে সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য পেতে চায়। কারণ, সে সাংসারিক বিপত্তি-বিভ্রাটে জড়িত না হয়ে সত্য কি তাই নিয়ে চিন্তা করতে চায়। হাসছেন? আচ্ছা, সত্য নিয়ে নয়, আরো সাংসারিক উন্নতি নিয়ে চিন্তা করতে চায়। কিন্তু সে সুযোগ অল্প কয়জন কেন পাবে, সকলেই কেন পাবে না? অবশ্য সকলকে সেই সুযোগ দিতে হ'লে সকলকেই কিছু না কিছু কায়িক শ্রম করতে হবে। অল্প কয়জনকে বিনা পরিশ্রমে কেবল চিন্তা করবার সুযোগ দিতে গেলে প্রকৃত পক্ষে গ্লানি ও লোভ বৃদ্ধি পাবে। এবং ক্ষমতা যত অল্প লোকের হাতে থাকবে তাদের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের পন্থাও ততই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়বে। শাসন এমনভাবে চালিত হওয়া উচিত যাতে প্রত্যেকে নিজেকেই শাসক আবার শাসিত মনে করতে পারে।

তার এই কথা আমার যুক্তিযুক্ত মনে হ'ল না। বললাম,—তুমি যদি আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন ক'রে থাক তাহলে অবশ্যই জান যে মনুষ্যশরীরে দুইটি উপাদান বর্তমান: এক মল, অন্যটি প্রসাদ। মল শরীরকে দূষিত করে, প্রসাদ শরীরকে পুষ্ট করে। মল পুষ্টিকর খাদ্য হতেই নির্গত হয় এবং বাত, পিত্ত, ও কফ রূপে শরীরের অনিষ্ট করে। বৈদ্যগণ সকল রোগের কারণ এই বাত, পিত্ত ও কফ ব'লে নির্দেশ করেছেন। মানুষের নানা সদ্‌গুণ সত্ত্বে কাম-ক্রোধ-লোভই তাকে চালনা করে। অতএব এই তিনের নিয়ন্ত্রণ নিমিত্ত বৈদ্যরাজরূপ একনায়ক শাসনপদ্ধতি আবশ্যক।

যুবক স্মিত হেসে বলল,—রাজগুরু মহাশয়, আয়ুর্বেদও একটি বেদ—পঞ্চম বেদ, এই রকম একটি মত থাকায় আমি বেদ অধ্যয়ন করতে গিয়ে এক সময়ে আয়ুর্বেদের পাঠ গ্রহণ করেছি এবং জেনেছি যে এই বাত-পিত্ত-কফ শরীর ধারণ নিমিত্ত আবশ্যক, কিন্তু যেটা যে পরিমাণে আবশ্যক তার তারতম্য হ'লে রোগের সৃষ্টি করে। তথাপি পুষ্টি হ'তে নির্গত মলের সৃষ্টি রোধ করতে পারবেন কি? বা রোধ করা বিধেয় হবে কি? কিন্তু মূল তর্ক থেকে আমরা দূরে এসে পড়েছি। আমি বলছিলাম, পৃথিবীতে নানা সত্য বিদ্যমান। আমরা যেন অন্ধ, হস্তীর এক একটি অঙ্গ স্পর্শ

Digitized by srujan ka@gmail.com

করে তাকেই হস্তী ব'লে ধারণা করে আপনাদের মধ্যে তর্ক ও যুদ্ধ করছি।

আমি বললাম,—আমরা আর্য। ভগবান স্বয়ং ধারাধামে অবতীর্ণ হয়ে আর্য ঋষিদের বেদ দিয়ে গেছেন। কোনও মানুষ তাকে সৃষ্টি করেনি। অন্যান্য দেশের আর যত ধর্মের কথা তুমি বলছ সমস্তই মানুষের উদ্ভাবন, কিন্তু বেদ অপৌরুষেয়, বৈদিক ধর্ম সনাতন ধর্ম। এ ভগবৎপ্রদত্ত।

চার্বাক সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বলল,—এমনি প্রহেলিকা সৃষ্টি করে আপনি হয়তো মূর্খ লোকদের আনুগত্য লাভ করতে পারবেন, কিন্তু তার দ্বারা সত্যের আলোক দেখতে পাবেন না। মানুষ চিরদিন মূর্খ থাকবে না, এক দিন বেদকেও মানুষ সূক্ষ্ম সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখবে, সীমাবদ্ধ জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকবে না, অসীমকে আপনি উপলব্ধি করতে চাইবে, অন্ততঃ চেষ্টা করবে। তখন আপনার এই বেদের স্থান কোথায় থাকবে তা দূরদৃষ্টির সাহায্যে একবার ভেবে দেখুন। সব ধর্মই মানুষের যুগানুযায়ী চিন্তা। সেই চিন্তাকে ভগবানের দেওয়া ইত্যাদি ব'লে প্রচার করলে নিজের গৌরববৃদ্ধি হয়তো হতে পারে কিন্তু তাতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। আরও এক কথা, লোকের অজ্ঞতাজনিত ভাবপ্রবণতার উপরে প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্র অথবা ধর্ম অথবা রাজনীতি সুপ্ত আগ্নেয়গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত নগরের মতই। কাজেই, রাজা যুদ্ধ করতে চান বলেই যারা যুদ্ধে যোগ দেয় তাদের কার্য নীতিসঙ্গত নয়।

আমি ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম,—তুমি নাস্তিক, অনাচারী। তুমি বেদের অবমাননা করেছ, এর উচিত দণ্ড পাবে। কাল তোমার বিচার হবে।

চার্বাক তেমনি হেসেই বলল,—আমি বিচার বা দণ্ডের জন্য দুঃখিত নই। আপনি যে এই গুরু সমস্যার সমাধানের জন্য চিন্তার পরিবর্তে বল প্রয়োগ করতে প্রস্তুত তাই আমাকে দুঃখ দিচ্ছে। বেশ, আপনার যেমন অভিরুচি।

এর পর আমি তৎক্ষণাৎ সেই যুবককে বন্দী করবার আদেশ দিলাম। পরদিন তাকে বিচারকমণ্ডলীর কাছে উপস্থিত করা হ'ল। বিচারকেরা বেদের অবমাননার দায়ে চার্বাককে পলালপীঠক নামক অতি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ড দিলেন।

চার্বাক তার দণ্ডাদেশ শুনে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে তার সেই স্মিত হাসি হাসল। বুঝতে পারলাম আমার ইঙ্গিতেই যে বিচারকগণ তাকে কঠিন মৃত্যুদন্ড দিয়েছেন তার জানতে বাকী নেই। বিচারকদের এই পরাধীন বিচারের জন্য আমি লজ্জা বোধ করলাম। কিন্তু পর মুহূর্তেই আমি ভাবলাম যে শাসন করতে গেলে এমনি কঠোরতা অপরিহার্য।

প্রহরিগণ চার্বাককে বন্দীশালায় নিয়ে গেল। তখনও তার নম্র, শান্ত ব্যবহার ও ভয়ঙ্কর প্রাণদণ্ডাদেশ শুনেও তার অবিচলিত ধৈর্য দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। তাই মৃত্যুর পূর্বে তার মত পরিবর্তনের জন্য আর একবার চেষ্টা করতে আমি বন্দীশালায়

Digitized by srujan ka@gmail.com

গেলাম।

বললাম,—তুমি তো বললে যে সাধারণ লোক বৈষয়িক উন্নতি চায়। তাই যদি হয় তবে কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচনের যোজনা, বাণিজ্যের জন্য যোজনা প্রভৃতির জন্য আমি রাজকোষ থেকে অর্থব্যয় করতে প্রস্তুত আছি। তুমি এ বিদ্রোহ প্রচারের চেষ্ট থেকে বিরত হও।

চার্বাক বলল,—জনসাধারণকে অজ্ঞ করে রাখলে সহস্র যোজনা সত্ত্বেও তাদের উন্নতি হবে না। বৈষয়িক উন্নতি আধ্যাত্মিক উন্নতির এক পন্থা হওয়া উচিত। নচেৎ তা কেবল অল্প কয়েকজনের অনাচার ধনলিপ্সা ও তজ্জনিত শোষণ, চৌর্য, প্রবঞ্চনা আদির সুযোগ করে দেয়। আধ্যাত্মিক উন্নতি নির্ভর করে সত্য জ্ঞানের উপরে। তাই, ক্ষমা করবেন রাজগুরু মহাশয়, আমি মিথ্যার নিকট মস্তক নত করতে পারব না, মৃত্যুভয়েও নয়। মহাশয়, আজ ইহধামে আমার শেষ দিন, দয়া করে পূর্বের আলোচনা আবার আরম্ভ করলে আমি সুখী হব।

বললাম,—দেখ, বেদের অবমাননা করলে তুমি নরকে পতিত হবে।

—আপনি একা কাউকে দোষী সাব্যস্ত করলেই কি ভগবান তাকে শাস্তি দেবেন? ভগবান তো আপনার অজ্ঞাবহ বেতনভোগী বিচারক নন। তাঁব বিচার অন্য প্রকার হ'তে পারে। এই সংসার মঞ্চে আপনি আপনার ভূমিকায় অভিনয় করছেন, আমাকেও আমার ভূমিকা অভিনয় করতে হবে। আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করব। যে শক্তি মানুষকে নানা কর্মে লিপ্ত করায় সে কোন শক্তি?

—কপিল মুনি বলেছেন, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্রা, অহঙ্কার—

বাধা দিয়ে চার্বাক বলল,—'ইতি অনুশুশ্রুম', 'এই আমি বলতে শুনেছি', অর্থাৎ আপনি এইরূপ শুনেছেন। কিন্তু আপনি স্বয়ং এ বিষয়ে কি চিন্তা করেছেন তাই আমি শুনতে চাই।

আমি নীরব রইলাম।

যুবক বলল,—আমি যা ভেবেছি তাই বলছি। মনুষ্যকে কর্মে লিপ্ত করায় কামনা। এই কামনাকে মিথ্যা, মায়া এসব ব'লে অস্বীকার ক'রে লাভ নেই। দেখতে হবে এই কামনা কি। পৃথিবী যখন তরুণ ছিল তখন অবিরত বর্ষণে মহাপ্লাবন হয়েছিল। সেই প্লাবন ধারণ করল মহাসমুদ্র, সেই সমুদ্রের তলদেশে জাত হ'ল প্রাণপঙ্ক এবং প্রাণপঙ্ক থেকে জাত হ'ল প্রাণকণা। এই প্রাণকণার একটি মাত্র কামনা ছিল—বেঁচে থাকা। এই কামনার প্রভাবে প্রাণকণার শারীরিক বিকাশ ঘটতে লাগল এবং ক্রমে ক্রমে সে প্রাণকণাগুলি গণনাতীত কাল ধ'রে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভাবে সংগঠিত হয়ে পশুপক্ষীতে পরিণত হল। এই নানা জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে কোনও এক জাতির মধ্যে এক নূতন কামনা জাত হ'ল, তা প্রতিষ্ঠা লাভের কামনা।

Digitized by srujan ka@gmail.com

এই দুইটি কামনার প্রভাবে সেই প্রাণীর শারীরিক বিকাশ এক বিশেষ ধরনে ঘটতে লাগল এবং কত লক্ষ কোটি বৎসরে তা মনুষ্যের আকার ধারণ করল। বলতে পারেন, জীব প্রথমে তামসিক ভাব নিয়ে জন্ম নিল এবং পরে কতক জীবের মধ্যে রাজসিক ভাবও এল।

মানুষের আকার পাবার পরে জীবের মধ্যে আর এক নূতন কামনা জন্মলাভ করল, তাকে সাত্ত্বিক ভাব বলতে পারেন। সে কামনা বা আকৃতি অসীমকে, মহাসৃষ্টির চরম সত্যকে উপলব্ধি করবার কামনা। প্রথম দুই কামনা হ'তে সৃষ্টি হয়েছে মানুষের কামাদি ইন্দ্রিয়সুখের বাসনা, অহঙ্কার প্রভৃতি। তৃতীয় কামনা হ'তে জ্ঞান-বিজ্ঞানাদির জন্ম। এদের মধ্যে কোনওটি কারও অপেক্ষা কম নয়। প্রথমটি না থাকলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি হ'তে পারত না। আবার তৃতীয়টি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আদি দিয়ে সাহায্য করে প্রথম ও দ্বিতীয়কে। এখন এই তৃতীয়ের পর হয়তো আবার এক নূতন চতুর্থ কামনার বীজ বপন হয়েছে মাত্র, কে বলবে? হয়তো সে এখন কেবল বিজ্ঞানের সোপানের প্রথম শ্রেণীতে। তৃতীয় কামনা প্রকৃতই আমাদের চরম সত্যের উপলব্ধিতে নিয়ে যাবে, না সে জন্য শুধু আমাদের প্রস্তুত করে তুলবে এবং শেষে আগামী কালের নূতন কামনাই আমাদের সেই উপলব্ধিতে নিয়ে পৌঁছাবে তা আমরা জানি না। তবে সে যাই হোক, আপাততঃ আমরা দেখছি প্রথম দুইটি কামনা—একত্রে তাদের বলা যাক বিষয় কামনা—যদি বেশী প্রশ্রয় পায় তাহলে এই তৃতীয় কামনা, সত্য উপলব্ধির কামনা, দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার তৃতীয়টিকে অধিক প্রশ্রয় দিলে, বিষয় কামনাকে একেবারেই অবহেলা করলে, জীবন ধারণ সম্ভব হয় না। অতএব, এক দিকে এই তামসিক ও রাজসিক (বা দুটিকে নিয়ে একত্রে বিষয় কামনা) ও অন্য দিকে সাত্ত্বিক বা সত্যোপলব্ধির কামনা—এদের মধ্যে সমন্বয় আবশ্যক। এই সমন্বয় সম্ভব করার জন্য আমাদের বাল্য কৈশোর ও যৌবনের শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক নীতি-নিয়মকে ব্রতী হ'তে হবে। অর্থনীতি রাজনীতি শাসননীতি সবই যেন সেই এক উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হয়, এবং কোনও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত বা দলগত উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয় সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে।

বিষয় কামনাকে প্রয়োজনের অধিক তুষ্ট বা তৃপ্ত করতে গেলে সত্যোপলব্ধির কামনা দুর্বল হয়ে পড়ে পূর্বে বলেছি। কিন্তু কেবল তাই নয়, বিষয় কামনার নিজেরও তাতে বিকৃতি ঘটে। মনুষ্যেতর জীবজগতে পর্যন্ত আমরা দেখি বিষয়সুখ পেতে গেলে সে জন্য রীতিমত চেষ্টা ও কষ্ট করতে হয়। মানুষের বেলা সেই সুখকে অতিশয় সহজলভ্য করে দিলে সেই সুখের গাঢ়তা বা তীব্রতা থাকে না; তাই পূর্ণ তৃপ্তিও মেলে না। তখন পরিপূর্ণ তৃপ্তির আশায় সেই সুখলাভের প্রক্রিয়াতে মানুষ নানা বৈচিত্র্য আনতে চেষ্টা করে এবং শেষে অতিমাত্র বৈচিত্র্য বিকৃতিতে পরিণত

Digitized by srujan ka@gmail.com

হয়। তথাপি অভীষ্ট সুখ বা তৃপ্তি মেলে না। এ কেবল তত্ত্ব কথা নয়, মনুষ্যসমাজে তা নিয়তই ঘটতে দেখা যায়। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় অশনে বসনে শয়নে রমণে সর্বথা কথা প্রযোজ্য। অতএব বিষয় কামনাকে তার উচিত স্থানে রাখলে তজ্জনিত সুখ সুস্থ ও সবল থাকবে এবং মানুষের অন্তরকে তৃপ্ত ও শান্ত ক'রে সত্যোপলব্ধির কামনায় প্ররোচিত করবে, মানুষকে তার অনন্ত ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তার চিন্তার প্রসার দেখে আমি নির্বাক হলাম। সে আবার বলল,—যে বিকৃতির কথা বলছিলাম তা বোধ হয় সেখানেই থেমে থাকবে না, এক মানসিক কর্কট রোগের মত তা আমাদের উৎকৃষ্ট চিন্তাকে এবং তৃতীয় কামনার ফলে উদ্ভুত আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানকেও বিকৃত করবে, যা আমাদের চিন্তা বীভৎস রূপ ধারণ করবে, পরস্পরকে হত্যা করাকে বলবে দেশপ্রেম, প্রবঞ্চনাকে বলবে রাজনীতি, কোনও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ কেবল কণ্ঠস্থ করাকেই বলবে ধার্মিকতা।

আবার বেদের প্রতি আক্ষেপ! আমি হতাশ হয়ে সে স্থান ত্যাগ করে ফিরে এলাম। পলালপীঠক অতিশয় নিষ্ঠুর দণ্ড। মস্তকের কেশসমূহ একত্রে গ্রন্থিবদ্ধ করে গ্রন্থিতে যষ্টি প্রবেশ করিয়ে প্রচন্ড আকর্ষণে কেশ সমেত মস্তকের চর্ম উৎপাটিত করা হয়। তার পরে করোটির সম্মুখভাগ ভগ্ন করে তার ভিতরে অত্যুষ্ণ লঙ্গিকা দেওয়া হয়। অবশ্য এর বহু পূর্বেই অপরাধীর মৃত্যু হয়। সমস্ত প্রক্রিয়াটির উদ্দেশ্য জনসাধারণের অন্তরে সন্ত্রাস উৎপাদন।

পিতা, আমি অনুসন্ধিৎসাকে হত্যা করেছি, দাম্ভিকতাকে ধর্ম বলে প্রশ্রয় দিয়েছি—

বলতে বলতেই মহাকাঞ্চন মহাশালের অশ্বকশা হাতে তুলে নিয়ে আপন দেহে কশাঘাত করতে লাগল। সোমদত্ত ও কাত্যায়নী হতবুদ্ধি হয়ে কয় মুহূর্ত নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকার পর সবলে তা নিবারণের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার মধ্যেই মহাকাঞ্চনের বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ রক্তাপ্লুত ও শরীর জর্জরিত হয়ে গেছে। সে হতজ্ঞান হয়ে ভূপতিত হ'ল।

॥ ১৫ ॥

মহাশাল সে সময়ে গৃহে ছিল না, সুভদ্র দেবের সাক্ষাৎলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রাসাদে গিয়েছিল। সোমদত্ত ও কাত্যায়নী কষ্টে মহকাঞ্চনকে তুলে শয্যায় শুইয়ে পরিচর্যা করতে লাগলেন।

পরদিন মহাকাঞ্চন সর্বাঙ্গে নিদারুণ পীড়া অনুভব করে শয্যাশায়ী হয়ে রইল। মহাশাল তার শয্যাপার্শ্বে এসে হেসে বলল,—আমি সব শুনেছি। এখন কেমন বোধ করছ?

Digitized by srujan ka@gmail.com

মহাকাঞ্চন বলল,—ও কিছু নয়। এখন আমি অনেক সুস্থ বোধ করছি। কাল সম্পূর্ণ সুস্থ হব।

কিঞ্চিৎ বিদ্রূপের সুরে হেসে মহাশাল বলল,—মহাকাঞ্চন, আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে তুমি নিজেকে সর্বাপেক্ষা ধার্মিক ভেবে ভুল করেছ। চম্পার বালকরূপী ভগবান যাকে নির্দেশ করেছিলেন সে যে আমি হ'তে পারি তা বোধ হয় তোমার ধারণার বাহিরে।

মহাকাঞ্চন নিতান্ত আশ্চর্য হয়ে বলল,—তুমি!!

মহাশাল তেমনই হেসে বলল,—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; মহাকাঞ্চন। ভেবে দেখ, তুমি দেশদ্রোহী। দেশদ্রোহীর নরকেও স্থান নেই। অপর পক্ষে আমি দেশসেবক। মুনিঋষিরা অনেক চিন্তা করে এক একটি আদর্শ স্থির ক'রে দেন। রাজা দেশের বিধিনিয়মাদি প্রণয়ন করতে সেই সকল আদর্শকেই মেনে চলেন। আবার, সেই সকল বিধিনিয়ম প্রচলনের জন্য আবশ্যক সুচতুর ও সাহসী সেনা। অতএব শেষ পর্যন্ত সব নির্ভর করে দেশের সেনাধ্যক্ষের উপর। আমি সেই সেনাধ্যক্ষ। চম্পার ব্যাপারে—আর মগধের ব্যাপারেও—তোমার ব্যর্থতার কারণ তোমার দেশদ্রোহিতা এবং মগধে উপযুক্ত সেনাধ্যক্ষের অভাব।

মহাকাঞ্চন নীরব হয়ে রইল। মহাশাল বলে চলল,—কলিঙ্গ রাজ্যের সঙ্গে মহাবীর জিনের জৈন আদর্শ আজ উত্তরে গঙ্গা থেকে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে নর্মদা ও তাপ্তী পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এ দেশের গৌরববৃদ্ধি কেবল আমারই জন্য। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও উপদ্রব থেকে কলিঙ্গবাসীদের রক্ষা করে কে? কলিঙ্গের মহাসৈন্যাধক্ষে মহাশাল। দেশের সুশাসন ও প্রজাদের মঙ্গলের চিন্তা করে কে? মহাশাল। তা হলে আমি যদি বলি ভগবান আমার প্রতিই নির্দেশ করেছিলেন তবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? আমি কর্মী, কর্মযোগী, আমার ব্রত দেশসেবা।

মহাকাঞ্চন বিমর্ষভাবে বলল,—মহাশাল, আমরা সকলে যে যার নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য জাতি বা দেশ বা ধর্মের দোহাই দিতে ব্যগ্র, নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য সহস্র নির্দোষ মানুষের হত্যা ও দুঃখের কারণ। আমরা দেশ জাতি বা ধর্মের সেবক কেবল মৌখিক ভাবে। স্বীকার করি আমার নরকেও স্থান নেই, কিন্তু সে হয়তো দেশদ্রোহিতার জন্য নয়, আর কোনও কারণে। যাই হোক, আমি তোমায় অনুরোধ করছি তুমি এই চম্পার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করো না। চম্পা নিজেই তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে না এবং পল্লীবাসীরাও কেউ এর অনুমোদন করবে না।

উত্তরে মহাশাল অবজ্ঞা ভরে বলল,—মূর্খ জনতার অনুমোদন কি ক'রে পেতে হয় তা আমার বিলক্ষণ জানা আছে, তোমায় বলছি শোন। প্রাদেশিক সুভদ্রদেবের

Digitized by srujan ka@gmail.com

সঙ্গে মন্ত্রণা করে আমি সমস্ত আয়োজন নিষ্পন্ন করেছি। শতাধিক পল্লীবাসীকে আমি প্রচুর অর্থ দিয়ে প্রচারে নিযুক্ত করেছি। সুভদ্রের আজ্ঞায় সুদক্ষ অক্ষরজীবক লৌহ কর্ণিকা দিয়ে একটি উত্তম প্রচারপত্র লিখে দিয়েছে, প্রচারকেরা তা কণ্ঠস্থ করেছে। তা ছাড়া একজন প্রচারককে চম্পার কাছেও পাঠিয়েছি চম্পাকে প্রবর্তনা দিয়ে তার স্বীকৃতি সংগ্রহের জন্য। হয়তো আর অল্পক্ষণের মধ্যেই তুমি দেখতে পাবে পল্লীবাসীরা এসে আমায় অনুরোধ করছে।

—আর. তুমি যদি ব্যর্থ হও?

—ব্যর্থ কেন হব? কি জন্য ব্যর্থ হব? শোন, চম্পাকে যে স্বয়ং ভগবানই দেখা দিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা তো সুনিশ্চিত। তুমি নিজে যখন এ কথা বিশ্বাস করেছ তখন আমার তো তাতে সন্দেহ নেই। এখন, ভগবানের নির্দেশ এই যে আমাদের পিতা সোমদত্তের তিন পুত্রের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা ধার্মিক তার আদেশেই চম্পা চলৎশক্তি ফিরে পাবে। সেই ধার্মিক পুত্র যখন তুমি নও তখন সে নিশ্চয় আমি। অবশ্যই সফল হব। আর, যদি একান্তই বিফল হই তখন আমার ধার্মিক বলে সুনাম রক্ষার উপায়ও আমি ভেবে স্থির করেছি।

—কি সে উপায়?

—আমি বিফল হ'লে আমার প্রচারকেরা চিৎকার করে বলবে 'এই চম্পা ডাকিনী, একে হত্যা কর?

—এ কথা আমি যদি প্রকাশ ক'রে দিই?

মহাশাল উচ্চহাস্য ক'রে বললে,—কলিঙ্গের মহাসৈন্যধ্যক্ষকে এত মূর্খ ভেবোনা যে সে এই সামান্য বিষয়টিও চিন্তা ক'রে দেখেনি। তুমি যদি এ কথা প্রকাশ কর কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। তার ব্যবস্থা করেছি। লোকে ভাববে তুমি বিফল হয়েছ ব'লে ঈর্ষারূপে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করছ।

—তোমার প্রচারকদের মধ্য থেকেই যদি কেউ প্রকাশ করে?

—করবে না। তাদের ভবিষ্যতে আরও অর্থ পাবার আশা আছে। এবং প্রাণের মায়াও আছে!

মহাকাঞ্চন নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল। একটি দীর্ঘশ্বাস মাত্র ফেলে অবশেষে বলল,—আমার আর কিছু বলবার নেই।

বাইরে পল্লীবাসীরা ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে। মহাশাল মহাকাঞ্চনের দিকে চেয়ে ঈষৎ হেসে উঠে গেল। পল্লীবাসীদের 'মহাশালের জয় হোক' ধ্বনি শুনে মহাকাঞ্চন আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই সময়ে সোমদত্ত ও কাত্যায়নী উভয়ে এসে প্রবেশ করলেন। মহাকাঞ্চন পিতামাতাকে বলল তার পুরাতন বন্ধু মধুকরকে যেন একবার সংবাদ দেওয়া হয়।

Digitized by srujan ka@gmail.com

॥ ১৬ ॥

মহাশাল পল্লীবাসিগণের সঙ্গে প্রস্থানের কিছু পরে মধুকর এসে প্রবেশ করল। দুই বন্ধু আজ বহু বৎসর পরে মিলিত হয়েছে। প্রথম কয় মুহূর্ত তারা কেবল পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। দুইজনেই এখন যৌবনের মধ্যাহ্নে উপনীত। দুইজনেই ক্ষীণ—একজন অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনে, অন্য জন শারীরিক অত্যাচারে। এক জনের মুখভাবে ব্যথা, অন্য জনের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। দুই জনেরই চক্ষু উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ।

অবশেষে মধুকর স্বচ্ছন্দ হাসি হেসে বলল,—বন্ধু, আমায় ডেকেছ?

মহাকাঞ্চনের ব্যথাতুর অধরপ্রান্তে একটি আনন্দের হাসি দেখা দিল। সে বলল,—বন্ধু, বহু বৎসর পরে 'বন্ধু' সম্বোধন শুনতে পেলাম!

মধুকর বলল,—সখা, বড় হবার দুঃখ তো সেইখানেই। তার বন্ধু কেউ নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহাকাঞ্চন বলল,—যথার্থই বলেছ, বন্ধু। তবু আমি বোধ হয় একেবারে বন্ধুহীন নই এমন মনে হ'ত—যখনই তোমার কথা মনে পড়ত!

—আমরা দু'জনে দুই বিপরীত পথের যাত্রী। আমি তো ভেবেছিলাম আমার মত অযোগ্য বন্ধুর কথা তুমি ভুলে গেছ।

—ভুল ভেবেছিলে, সখা। আমি সর্বদাই তোমার সংবাদ সংগ্রহ করেছি বা চেষ্টা করেছি—তুমি যে অ-চলা পথের পথিক!

মধুকর হেসে বলল,—সে সব সংবাদ নিশ্চয় তোমার আনন্দ বর্ধন করেনি!

—তা কেন। শুনেছি—তুমি বহু সরস ও ভাবগর্ভ নাটক রচনা করেছ। আমি তোমার স্বতন্ত্র ধারার চিন্তার আভাস বহু পূর্বেই পেয়েছিলাম, কিন্তু আপন অহমিকার বশে তাকে তখন অবজ্ঞা করেছিলাম। এখন তার মূল্য হৃদয়ঙ্গম করছি। বন্ধু, সেই প্রকার স্বতন্ত্র চিন্তার শক্তি আমার নেই। আমি আমার জীবনে অনুষ্ঠান ও বিধি-নিয়মের সঙ্কীর্ণ পথেই চলেছি। আর একজনের তোমার মত মৌলিক চিন্তাশক্তি ছিল,—কিন্তু—কিন্তু—আমি তার প্রাণদন্ড দিয়েছি মধুকর, আমি তার কণ্ঠরোধ করেছি। বন্ধু, তার চিন্তাধারা অনেকাংশে তোমার চিন্তাধারার মত। তাই এখন অনুরোধ তুমি তোমার নাটকগুলি লোকসমক্ষে উপস্থিত কর।

মধুকর মধুর হেসে বলল,—বন্ধু, এই ঘরছাড়াকে চিরকাল সুদীর্ঘ পথ ডাক দিয়ে গেছে, ডাক দিয়ে আকুল করেছে। জীবনকে আমি সর্বমতে উপভোগ করেছি, কিন্তু বারে বারেই সব ছেড়ে আমায় পথে বেরুতেই হয়েছে। কারণ আসলে আমি পথধর্মী, অনিকেত। আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, দেশবিদেশ নানা আশ্চর্যও দেখেছি। আমার কোনও অনুশোচনা নেই, কারণ আপন সুখ উপভোগের জন্য কখনও অন্যকে দুঃখ দিই নি। আমার অতিশয়

Digitized by srujan ka@gmail.com

আশাও নেই। আমি যখন একলা বসে আমার নাটক পড়ি বা আবৃত্তি করি তাতেই আমার আনন্দ হয়। বীণাকর যেমন আপন মনে তার বীণায় সুর সৃষ্টি ক'রে আপনি শুনেই আনন্দ পায়। আমার নাটক যদি আদর না পায় তাতেও আমার দুঃখ নেই, কারণ সেগুলি লোকসমক্ষে আনবার স্পৃহাও আমার নেই।

—সখা মধুকর, তোমার এমনি বিশৃঙ্খল জীবনের অন্তে তবে আত্মার সদ্গতি কোথায়?

—এ প্রশ্ন আমায় কে করছে, মহাযোগী মগধ রাজগুরু না বন্ধু মহাকাঞ্চন?

—তোমার বন্ধু।

—তবে বলি, বন্ধু, বিশৃঙ্খল জীবন তুমি কাকে বল? তোমরা ঐ যে বল 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ' সেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ না করাকেই কি তুমি বল বিশৃঙ্খল জীবন? তুমি কি বলতে চাও ভগবান পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রে, আবার মানুষকে সেই সৌন্দর্য উপভোগের উপযুক্ত দেহ-মন দিয়েও এ দুইয়ের যোগাযোগ না ঘটানোকেই উত্তম আদর্শ ব'লে কোথাও মানুষকে কোনও অলক্ষ্য নির্দেশ দিয়েছেন?

মহাকাঞ্চন নীরবে ভাবতে লাগল।

মধুকর একটি গৈরেয় খণ্ড নিয়ে ভূমিতে একটি ডমরু অঙ্কন ক'রে বলল,—আমার ধারণায় এই ডমরুর দক্ষিণাংশ যদি জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য ও সুখদুঃখের বস্তু বা 'বিষয়' হয় তবে এর ক্ষীণ মধ্যভাগ সে সমস্ত অনুভব ও উপভোগ করবার ইন্দ্রিয়শক্তি, এবং এর বাম অংশ ভগবান ও চরম লক্ষ্য বা পরম সত্য যাই বল। এই ক্ষীণ মধ্যভাগে দুইটি সুতায় দুইটি মৃৎপিন্ড বাঁধা আছে, একটি আমাদের বুদ্ধি অপরটি মন। এর মধ্যভাগ সঞ্চালন করলে মৃৎপিন্ড দুইটি ডমরুর দক্ষিণে ও বামে ক্রমাগত আঘাত ক'রে যে শব্দ উৎপন্ন করে তা আনন্দ। আমি সেই ডমরু বাজিয়ে সেই আনন্দ লাভের চেষ্টায় আমার জীবন অতিবাহিত করেছি। এতে কখনো বা স্খলন হয়েছে স্বীকার করি, কখনো বা ডমরু সঞ্চালনের শক্তিও খুঁজে পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস মৃত্যুর পর যদি পরমেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তাঁকে সব বুঝিয়ে বললে তিনি নিশ্চয় বুঝবেন। তিনি ভদ্রলোক তো বটেন!

মহাকাঞ্চন পুনশ্চ দীর্ঘশ্বাস মোচন ক'রে বলল,—বন্ধু, তিনি এখনই বুঝেছেন, তিনি তো ভাবগ্রাহী। কিন্তু আমি পাপী, আমার নরকেও স্থান নেই।

বলতে বলতে দুই বিন্দু অশ্রু মহাকাঞ্চনের গন্ডদেশ সিক্ত করল।

মধুকর মহাকাঞ্চনের হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বলল,—বন্ধু কেন এমন আক্ষেপ করছ। তুমি তোমার বিশ্বাস মতে দৃঢ়চিত্তে কর্তব্য করে গেছ। সে বিশ্বাস যদি ভ্রমাত্মকও হয় তবু তা অকপট, তোমার কার্য ছলনাশূন্য। কেউ পাপী নয় বন্ধু, কোনও কর্মই পাপ নয় যদি সে কর্ম ভ্রান্ত হলেও তার মধ্যে বিরাটকে

Digitized by srujan ka@gmail.com

উপলব্ধি করবার আকৃতি থাকে। তাঁর সৃষ্ট সৌন্দর্যকে অনুভব ও উপভোগ করার মধ্যেও তাঁকে জানবার আকৃতি থাকে বৈ কি।

—বন্ধু, সে কথা তো আমি বলতে পারব না। একদিন সে বিশ্বাস আমার ছিল, কিন্তু এখন নেই।

—অবশ্যই সামাজিক স্তরে ভাল-মন্দ পাপ-পুণ্য আছে এবং থাকা উচিত। কিন্তু যে সত্যসন্ধ, যে আপন জীবনের বিনিময়ে সত্যের সন্ধান করছে, পরম সত্যকে জানতে চাইছে, সে কি তাতে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে? কোনও বিশেষ রোগের নিদান নির্ণয়ের জন্য ভিষক্ যদি মূষিকের উপর কোনও ভেষজের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে গিয়ে সে মূষিক হত হয় তবে কি তার পাপ হবে?

—কোথায় যে কার সীমা বা গণ্ডি বা অধিকারের ক্ষেত্র, সেইরূপ সীমা আদৌ আছে কি না—কিছুই বুঝতে পারছি না, বন্ধু।

—সখা কাঞ্চন, যদি দোষ না নাও তো তোমায় একটা কথা বলি। চম্পাকে আদেশ করতে গিয়ে তুমি ভুল করেছ। এ কথা আমি পূর্বেই তোমায় বলতাম, কিন্তু বলবার সুযোগ পাইনি। তুমি তখন জনমত্ততার তরঙ্গশীর্ষে বাহিত হচ্ছিলে, বললেও হয়তো কর্ণপাত করতে না। আমার মনে হয় তোমরা তিন ভ্রাতার মধ্যে কনিষ্ঠ মহাসার সর্বাপেক্ষা ধার্মিক। সে আদেশ করলেই চম্পা তার পা ফিরে পাবে।

মহকাঞ্চন অতিমাত্র আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল,—মহাসার!!! সখা, তুমি পরিহাস করছ।

—আদৌ না। তুমি বলতে পার তার সাধনা নেই, জ্ঞানও নেই। কিন্তু ভগবান যে এই দুইটি গুণকে প্রাধান্য দেবেন তার কি কোনও অর্থ আছে? মহাসার একজন প্রকৃত ভদ্রলোক, যে 'আমি আগে, আমি আগে, ব'লে ব্যস্ত হয় না। তা ছাড়া সে অকপট। বন্ধু, পুত্র, পিতা ও স্বামী ভাবে তার কর্তব্য সে নিষ্ঠাপরভাবে পালন করে চলেছে। লোকসাধারণের বিদ্রূপ ও ঘৃণা সে কেবল নীরবে সহ্য করেনি, কারও প্রতি সামান্য ক্রোধ বা বিদ্বেষও সে পোষণ করে না। নিজের সাধ্য মতে বরং সে লোকের উপকার করে, আবার তার জন্য কোনও প্রত্যুপকার প্রত্যাশা করে না। তা পেলে খুশী হয়, না পেলে দুঃখিত হয় না। পুরোহিত বা ভিক্ষুদের মত সে অন্যের শ্রমে নিজের প্রতিপোষণ করে না। আপন শ্রমে সাধু উপায়ে উপার্জন ক'রে আপন পরিবার পালন করে। অন্যের ধনবত্তা বা অধিক অর্থাগণ তাকে ঈর্ষান্বিত করে না। তেমনই নিজের অর্জিত অর্থের উপরেও তার অত্যন্ত আসক্তি নেই। জীবনের সুখের জন্য সে বিধাতার নিকট কৃতজ্ঞ, দুঃখের প্রতি নির্বিকার। সে স্বয়ং সদানন্দ, কেউ তার কাছে গেলেও তাকে আনন্দদানের চেষ্টা করে। সকল কর্ম করে কিন্তু কর্মের প্রতি তার আসক্তি নেই। অসম্ভব কি যে ভগবান এই ব্রাহ্মণ

Digitized by srujan ka@gmail.com

কুলপাংশুলের প্রতিই নির্দেশ করেছিলেন।

মহাকাঞ্চন কিয়ৎক্ষণ নীরব থেকে তারপর খেদের স্বরে বলল,—সখা মধুকর, সকলের অপেক্ষা তুমিই আমাকে বেশী জান। এ কাজে হস্তক্ষেপ করবার পূর্বে আমি বহু চিন্তা করেছি। আমার নিশ্চিত ধারণা হল যেন বেদের মহিমা প্রচারের জন্য ভগবান আমার প্রতি নির্দেশ করেছেন। আমি এখন উপলব্ধি করছি মানুষই সবার উপরে এবং মানবিকতাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেহ যুবক একদিন তোমার মতই বলেছিল, "জীবনধারণ ও তার উন্নতি এবং নূতন জীবন সৃষ্টির জন্য মানুষের যা যা কর্তব্য তা ত্যাগ করা উচিত নয়। জ্ঞান, ধর্ম, দেশ, জাতি বা জাতীয়তা ইত্যাদি নামের মোহে যে তা ত্যাগ করে সে তামস।" কিন্তু সখা, মহাশাল এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বদ্ধপরিকর।

—তার বুদ্ধির শক্তি অপেক্ষা চিরকাল দেহের শক্তিই অধিক। যে কোনও মতে তাকে নিরস্ত কর।

—তা আমার সাধ্যাতীত। এই ব'লে মহাকাঞ্চন মহাশালের সমস্ত কূট কার্যপন্থা বিবৃত করল।

মধুকর সব শুনে চিন্তিত হ'ল—চম্পার জীবনের জন্য। অবশেষে বলল,—যে করেই হোক চম্পাকে রক্ষা করতে হবে। তুমি কথা দাও আমায় সাহায্য করবে।

—অবশ্যই কথা দিচ্ছি।

—ধন্য, বন্ধু। আজ তবে যাই—ব'লে মধুকর উঠল।

মহাকাঞ্চন মধুকরের হাত ধরে বলল,—বন্ধু, আজ আমি যে সন্তোষ লাভ করলাম তা অপূর্ব, তার তুলনা হয় না।

মধুকর সানন্দে মহাকাঞ্চনকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিল।

॥ ১৭ ॥

সুখিপল্লীর সমস্ত অধিবাসীর মনে অচিরে ধারণা জন্মাল যে তাদের সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশাল একজন মহাধার্মিক এবং চম্পাকে ভগবান যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা মহাশালের প্রতি লক্ষ্য করেই। উপরন্তু তারা এই জনরব শুনল যে মগধরাজ পুষ্যমিত্র যবনরাজ দত্তমিত্রের (ডিমেট্রিয়স্) সঙ্গে মিলিত হয়ে পুনরায় কলিঙ্গ আক্রমণ করতে আসছেন এবং ইতিমধ্যে বৌদ্ধরাজ্যের সন্নিকটে এসে পড়েছেন। এ সংবাদ কে আনল কিংবা কোথা থেকে পাওয়া গেল তা কেউ জানে না, এবং যেহেতু ব্যাপারটি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে সেইহেতু এখন সংবাদের সূত্র অনুসন্ধান করা বাহুল্য মাত্র। এখন সকলেই ভীত, শঙ্কিত। কেবল কলিঙ্গের মহাসৈন্যাধ্যক্ষ মহাশাল বর্তমানে সুখিপল্লীতে অবস্থান করছেন বলে জনসাধারণ অভয় ও আশ্বাস লাভ করল। বরং এখন তারা

Digitized by srujan ka@gmail.com

সুখিপল্লীতে মগধের রাজগুরু মহাকাঞ্চনের উপস্থিতিকেই সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগল। কেউ কেউ যখন বলল যে এ জনরব সত্য হলে মহাশাল এখানে থাকতেন না, তাঁর সেনাদলসহ যুদ্ধযাত্রা করতেন, তৎক্ষণাৎ তার উত্তর পেল যে অতিশয় সন্দেহভাজন মহাকাঞ্চন এখানে আছেন বলেই মহাশাল এখানে অবস্থান্ করছেন। মহাকাঞ্চন তো সহজ লোকটি নন, তাঁর মনে কি আছে তা ভগবানেরও অগোচর, মহাশালের অগ্রজ হয়েও তিনি শত্রুপক্ষীয়। তাই তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যই স্বয়ং সৈন্যাধ্যক্ষ এখানে রয়েছেন।

এই সবের মধ্যে পল্লীর কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি এসে মহাশালকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাল চম্পাকে আদেশ দিয়ে তাকে তার দুর্দশা থেকে উদ্ধার করতে। মহাশাল অতিশয় বিনয় সহকারে প্রথমে তা করতে অস্বীকৃত হল এবং পরে যেন বাধ্য হয়েই তাতে সম্মত হ'ল। পল্লীবাসীরা স্থির করল, যে পরিত্যক্ত মন্দিরে চম্পা ভগবানের দর্শন লাভ করেছিল সেইখানেই তার উদ্ধার হওয়া উচিত হবে। মহাশালের ইচ্ছা ছিল বিনীতার সমাজেই তা করবার, কিন্তু তাতে কেউ কিছু ভাবতে পারে এই ভেবে সে তার সে ইচ্ছা প্রকাশ করল না। বিনীতা নিজেও মহাশালের এই মনোগত ইচ্ছার কথা জানতে পারল না।

পরদিন প্রভাতে প্রাচীন, পরিত্যক্ত মন্দির প্রাঙ্গণ সুখিপল্লী ও অপরাপর নিকটবর্ত্তী পল্লীর অধিবাসিসমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মন্দির চত্বরের নিকটে কতকগুলি কাষ্ঠাসনে পল্লীর প্রধান ব্যক্তিগণ বসলেন। স্থানে স্থানে প্রকান্ড পাত্রে পানীয় রক্ষিত হয়েছে ও মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্যগীতের আয়োজন হয়েছে যাতে কেউ হঠাৎ সভাস্থল ত্যাগ করতে ইচ্ছুক না হয়। ধূপ ও পুষ্পের সুবাসে সমস্ত স্থানটি আমোদিত। মহাকাঞ্চন ও মধুকর প্রচ্ছন্নভাবে জনতার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হ'ল।

এই সময়ে দূরে বাদ্য ও শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। পল্লিবাসীরা চেয়ে দেখল দীর্ঘ শোভাযাত্রার মধ্যস্থলে সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশাল যোদ্ধৃবেশে রথারূঢ় হয়ে আসছেন। শোভাযাত্রার সম্মুখ ভাগে এক প্রমোদন-গোষ্ঠী গীত গাইতে গাইতে ও সিংহ ব্যাঘ্র ঋষভ প্রভৃতি পশুর বিরাট—অবশ্য শূন্যগর্ভ প্রতিমূর্তি বহন করে আনা হাস্যোদ্রেককারী ভঙ্গিতে সেইগুলিকে নৃত্য করাতে করাতে নিয়ে আসছে। মহাশাল করজোড়ে সকলকে সবিনয় নমস্কার করছেন।

শোভাযাত্রা ক্রমে নিকটবর্ত্তী হ'লে প্রধানেরা পুষ্পমাল্য নিয়ে মহাশালকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে আসার জন্য উঠে গেলেন। মহাশাল রথ হ'তে অবতরণ করে কণ্ঠে পুষ্পমাল্য গ্রহণ করে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে নমস্কার করতে করতে সভামণ্ডপে প্রবেশ করে চত্বরস্থ উচ্চাসনে উপবেশন করলেন। তখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মহাশালকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হল। তার বৃহৎ

Digitized by srujan ka@gmail.com

মুখমণ্ডল পুষ্পহারে বহু প্রায় লুপ্ত হ'ল। বৌদ্ধসঙ্ঘের সিদ্ধাচার্য ধর্মপাল ব্যতীত আর সকল ভিক্ষুগণ সভায় উপস্থিত। ধর্মপাল বজ্রগুরুর নিকট হ'তে অদ্যাপি প্রত্যাবর্তন করেননি। সিদ্ধাচার্যের অনুপস্থিতিতে ভিক্ষুগণ সভায় আসতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু মহাশালের নিয়োজিত কত জন দুর্দান্ত যুবক তাঁদের ভয় প্রদর্শন করায় তাঁরা আসতে বাধ্য হয়েছেন।

পুষ্পহার অর্পণের পর ভিক্ষুগণ মহাশালকে আশীর্বাদ করলেন। মহাশাল তাঁদের সভক্তি প্রণাম ক'রে পুনরায় আপন আসনে উপবিষ্ট হলেন। তখন আবাহন সঙ্গীত গীত হ'ল এবং তার পর বৃদ্ধ গ্রামপ্রধান আসন ত্যাগ করে উঠে মহারাজ খারবেল ও তাঁর মহাসৈন্যাধ্যক্ষ মহাশালের বহু স্তুতিগানপূর্বক মহাশাল যে একজন পরম ধার্মিক ব্যক্তি এ বিষয় সাব্যস্ত করে অতঃপর তাঁকে চম্পার উদ্ধার রূপ মহৎ কার্যে আহ্বান করলেন।

প্রত্যুত্তরে মহাশাল গ্রামপ্রধান ও পল্লীবাসীদের বহু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল যে কেবল দেশসেবার কারণেই সে এই কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে, নচেৎ আপন ধার্মিকতা এইভাবে প্রকাশ করাকে সে ঘৃণা করে।

চম্পা চত্বরের এক প্রান্তে তার যষ্টি দু'খানি অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবার এত বিরাট আয়োজন দেখে সে বিমূঢ়, বিহ্বল। এত আয়োজনের কি প্রয়োজন তা বুঝতে না পেরে সে হতবুদ্ধি, কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধচিত্ত। অপর পক্ষে মহাশাল পূর্ব হতে সব জানলেও এখন তা চাক্ষুষ ক'রে স্বয়ং অভিভূত, তার প্রকৃতই বিশ্বাস জন্মেছে যে সে সফল হবে। আসন ত্যাগ করে উঠে ব্রজনির্ঘোষ সদৃশ কণ্ঠে সে বলল,—চম্পা, আমি তোমায় আদেশ করছি তুমি তোমার যষ্টি ত্যাগ করে স্বপাদে গমন কর।

চম্পা আসাবাড়ি দু'খানি ফেলে দিয়ে এক পা অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা মাত্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূপতিত হয়ে আকুলভাবে ক্রন্দন করতে লাগল।

এত বড় ধার্মিকের এমন অপমান! সমবেত জনতার মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে উঠল,—মিথ্যাচারিণী—ডাকিনী—এই চম্পাকে হত্যা কর!

তার সুরে সুর মিলিয়ে পল্লীবাসীরা উন্মত্ত চিৎকার করল,—এ ডাকিনী, একে হত্যা কর—হত্যা কর!!

এমন সময়ে মহাকাঞ্চন ও মধুকর ত্বরিতে জনতার অগ্রবর্তী হয়ে চত্বরে আরোহণ করল। মহাকাঞ্চন দৃঢ়, উচ্চকণ্ঠে বলল,—সকলে ক্ষান্ত হোন, আমার কথা শ্রবণ করুন।

জনতার মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে বলল,—আপনি কে? আপনি তো

Digitized by srujan ka@gmail.com

মগধের গুপ্তচর! আপনার কথা আমরা শুনতে চাই না। চম্পা মহাপাপিনী, আমরা তার মৃত্যু চাই।

সমস্ত জনতা আবার চিৎকার করে উঠল,—মার ডাকিনীকে! মেরে ফেল!

মহাকাঞ্চন উৎক্ষিপ্ত জনতাকে জোড়হস্তে বলল,—আপনারা শ্রবণ করুন। আমি দাম্ভিক, এবং মহাশাল উদ্ধত। ভগবান আমাদের দুইজনের কাউকে নির্দেশ করেন নি। আমরা দু'জনেই তাই আমাদের দর্পের উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছি। ভগবান যাকে নির্দেশ করেছেন সে আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাসার।

তখন মহাশাল দাঁড়িয়ে উঠে বলল,—আমার পূজনীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার প্রতি আক্ষেপ করে যা বললেন তা আমি শিরোধার্য করলাম, কিন্তু তিনি যে হাস্যকর প্রস্তাব করলেন তাই থেকেই আপনারা বিচার করে দেখবেন সে আক্ষেপ কতখানি যথার্থ। আমি বিশেষ কিছু বলব না, ফলেন পরিচীয়তে। আমরা মহাসারকে আহ্বান করি।

বহু লোক যুগপৎ হেসে উঠে বলল,—মহামূর্খ মহাসার? আমরা এ প্রহসন দেখতে চাই না। আমরা চম্পার মৃত্যু চাই!

মহাকাঞ্চন ক্ষিপ্ত হয়ে বলল,—মূর্খ জনতা, হাসো! আমার ও মধুকরের দেহে প্রাণ থাকতে চম্পার কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

মহাকাঞ্চনের জলন্ত চক্ষু ও তেজ দেখে জনতা পিছিয়ে গেল। দুই একজন প্রতিবাদের চেষ্টা করল, কিন্তু অন্যেরা তাদের থামিয়ে দিয়ে মহাকাঞ্চনকে বলল,—বলুন, আপনি কি বলতে চান। সত্বর বলুন।

মহাকাঞ্চন বলল,—শুনুন। ভগবানের নির্দেশ ছিল সোমদত্তের যে পুত্র সর্বাপেক্ষা ধার্মিক তারই আদেশে চম্পা তার পাদদ্বয়ের শক্তি ফিরে পাবে। আমি ও মহাশাল বিফল হয়েছি। এবার মহাসার আদেশ দিক। নিতান্তই সে যদি বিফল হয় তাহ'লে আপনারা যা উচিত বিবেচনা করবেন তাই করবেন।

জনতা এ যুক্তি সমর্থন করল। তারা মনে মনে ভাবল এ কখনওই মহাসারের সাধ্য নয়। বৃদ্ধ গ্রামপ্রধান বললেন,—আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু এর পরে চম্পার শাস্তি হওয়া উচিত। অতএব এই প্রহসনের পরে আপনি অবশ্য চম্পাকে আমাদের হাতে সমর্পণ করবেন।

মহাকাঞ্চন আহ্বান করল—মহাসার...

মহাসারকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এ সমস্ত শুনে মহাসার বট আরোহণ করে আত্মগোপন করেছিল। একজন হঠাৎ দেখতে পেয়ে তাকে টেনে নামাল।

মহাসার হাত জোড় করে কেবল বলতে লাগল,—না, না, না... জনতা চিৎকার করে বলল,—ওকে ধরে টেনে নিয়ে এস। শীঘ্র এ প্রহসন শেষ কর।

Digitized by srujan ka@gmail.com

কয়েকজন মিলে তার হাত ধরে টানতে লাগল। মহাসার নানা অনুনয় বিনয় করতে করতে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে লাগল। তখন সবাই ওকে ধরে তুলে নিয়ে গিয়ে চত্বরের উপরে ফেলল।

মহাসার মহাকাঞ্চনের পদতলে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল,—দাদা, কেন তুমি আমায় এ শাস্তি দিতে চাইছ। আমার প্রতি যদি তোমার এতটুকুও দয়া থাকে তবে আমায় ছেড়ে দাও, আমি আর কিছু চাই না। যা আপনি ও মহাশাল পারেননি এ অকিঞ্চন তা কি করে পারবে।

মহাকাঞ্চন মহাসারকে তুলে আলিঙ্গন ক'রে বলল,—হে বিধেয়াত্মা, হে পরমযোগী, দর্পিত ও দাম্ভিক বিনাশপ্রাপ্ত হবে, ভদ্র ও বিনয়ী পৃথিবীকে শান্তি ও সাম্যের আলোক দেখাবে—এই ভগবানের সঙ্কেত। চম্পা, তুমি উঠে এস।

চম্পা ভয়ে ভূতলশায়িনী হয়েছিল, কাতর স্বরে বলল,—আমায় ক্ষমা করুন। আমি পাপিনী। আমি আমার পা ফিরে পেতে চাই না। আমায় ছেড়ে দিন, আমি ঘরে যাই।

মহাকাঞ্চন চম্পার হাত ধরে তুলে দাঁড় করাল। মহাসারকে বলল,—এস, চম্পার মস্তকে তোমার হাত রাখ। মহাসার তবু কাতরভাবে বলতে লাগল—আমি পারব না, আমি পারব না...

মহাকাঞ্চন সবলে মহাসারের হাত নিয়ে চম্পার মাথায় রাখল। বলল,—এবার আমি যা বলছি তাই বলঃ 'মূকং করোতি বাচালং...'

মহাসার লজ্জিতভাবে বলল,—দাদা, একটু আস্তে আস্তে বল, নয় তো ও সংস্কৃত উচ্চারণ আমি করতে পারব না।

জনতা হেসে উঠল

অতঃপর মহাকাঞ্চন শ্লোকের প্রতিটি পদ একৈকভাবে উচ্চারণ করতে লাগল। মহাসার ভীতভাবে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দিকে চেয়ে চেয়ে তাঁর উচ্চারিত পদগুলির পুনরাবৃত্তি ক'রে চলল। শ্লোকটি সারা হ'লে মহাকাঞ্চন বলল,—এবার বল, 'আমি তোমাকে আদেশ করছি তুমি তোমার যষ্টিদ্বয় ত্যাগ করে স্বপাদে গমন কর।' এই কথাগুলি মহাকাঞ্চন উচ্চকণ্ঠে দৃঢ়স্বরে বলল। কিন্তু মহাসার সসঙ্কোচে এতই নিম্নকণ্ঠে তার পুনরাবৃত্তি করল যে জনসাধারণ তা শুনতে পেলনা।

চম্পা তার বাড়ি দুখানি ফেলে দিল। সমগ্র জনতা প্রস্তুত হয়ে রইল চম্পা পড়ে যাওয়া মাত্র তাকে তুলে নিয়ে যাবে তার বিচার করতে। মহাশালও নিজ আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল। চম্পা একখানি পা বাড়াল, কোনও যন্ত্রণা অনুভব করল না। কিন্তু এ যেন তার বিশ্বাস হ'ল না! কিছুক্ষণ তেমনই দাঁড়িয়ে থেকে তার পর সে সাহস করে আর একটি পা বাড়াল। এবারও কোনো

Digitized by srujan ka@gmail.com

কষ্টবোধ নেই! এখন আর তার কোনও সন্দেহ রইল না। অসহনীয় আনন্দে চম্পা কেঁদে ফেলল, স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হয়ে সে হঠাৎ মা মা বলে চিৎকার করতে করতে দৌড়াতে লাগল। চম্পার মাও দৌড়ে গিয়ে চম্পাকে জড়িয়ে ধরল। চম্পা মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে অধীর হয়ে কাঁদতে লাগল।

সমগ্র জনতা কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর মহানন্দে করতালি দিয়ে নৃত্য করতে লাগল। নারীরা ঘন ঘন চোখের জল মুছতে লাগল। এই আনন্দ কোলাহলের মধ্যে মহাসার কখন চত্বরের উপর থেকে নেমে জনতার মধ্যে মিশে গেছে। মহাশাল অনন্যোপায় হয়ে আনন্দে যোগ দিল। কিন্তু তার মুখভাবে আনন্দ দেখা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ পরে পল্লীবাসীরা আনন্দ কলরবে ক্ষান্ত হয়ে চেয়ে দেখল চত্বরের উপরে তখনও দাঁড়িয়ে মহাকাঞ্চন ও মধুকর। লোকেরা এসে মহাকাঞ্চনকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে বলতে লাগল, আপনি মহাধার্মিক, মহাপুরুষ! মহাকাঞ্চন অস্থির ও বিব্রত হয়ে মধুকরকে বলল,—বন্ধু, এ আবার কি নূতন বিপদ?

মধুকর নিরুপায় ভঙ্গিতে বলল,—এদের কে বোঝাবে, বল। যোগ, সাধনা, সন্ন্যাস, তত্ত্বজ্ঞান—এই সবের সংস্কার এদের মনে এমন শিকড় গেড়েছে যে এরা কখনও বিশ্বাস করবে না অতি সাধারণ লোক তার অতি সাধারণ কর্তব্য নিষ্ঠা-সহকারে পালন ক'রে যে মহাপুন্য অর্জন করে তা অনেক সময়ে জ্ঞানী যোগী সন্ন্যাসীদের চাইতে অনেক বেশী। কতকগুলি শব্দের মোহে লোকে এমন মোহাবিষ্ট যে সার তত্ত্বের প্রতি কারও দৃষ্টি নেই।

তথাপি বাধ্য হয়েই মহাকাঞ্চন পল্লীবাসীদের সম্বোধন করে বলল,—আপনারা এ কি করছেন। এ অভিনন্দন এ ভক্তি আমার প্রাপ্য নয়...

পল্লীবাসীরা ভাবল এ মহাকাঞ্চনের সাধুজনোচিত বিনয়, বিনয়বশতঃ তিনি নিজে চম্পাকে উদ্ধার না ক'রে মহাসারের দ্বারা করালেন। নচেৎ মূর্খ মহাসারের কি শক্তি আছে যে এমন অলৌকিক কর্ম করবে। মহাকাঞ্চন নিজে যদি মহাসারের হাত ধ'রে না থাকতেন, নিজে যদি সেই আদেশ মহাসারকে দিয়ে না বলাতেন, তা হ'লে মহাসারের দ্বারা কি এ কোনও মতেই সম্ভব হ'ত? মহাকাঞ্চনের বিনয়ে পল্লীবাসিগণ ততোধিক মুগ্ধ হয়ে তার জয়গান করতে লাগল।

মহাকাঞ্চন আর কোনো উপায় না দেখে অসহায় হয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগল। পল্লীবাসীরা দেখল মহাকাঞ্চন ধ্যানে বসেছেন। তখন তারা নীরব হ'ল এবং আর কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আপন আপন গৃহে ফিরে গেল। তাদের সঙ্গে চম্পা ও চম্পার মাও ঘরে ফিরল।

মহাকাঞ্চন প্রার্থনা শেষ করে উঠে মধুকরের স্কন্ধে হাত রেখে বলল,—বন্ধু, আমার জীবনে এই আমার চরম ব্যর্থতা। এ যেন পরের ধন অপহরণ ক'রে আপন

Digitized by srujan ka@gmail.com

সুখ বৃদ্ধি করা। কিন্তু এ ধন যার সে তো দিব্য নির্বিকার। আমি আর সুখিপল্লীতে থাকব না। সেই যুবক আমায় যে পথের সঙ্কেত দিয়েছিল সেই পথে যাব। কিন্তু যাবার পূর্বে... একবার...

মধুকর মহাকাঞ্চনকে সান্ত্বনাদানের ভঙ্গিতে তার হস্ত ধারণ করে তাকে সঙ্গে নিয়ে নীরবে প্রস্থান করল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত পল্লীবাসীরা আনন্দে মেতে রইল। সকলের মুখে সম্ভব অসম্ভব নানা অলৌকিক প্রসঙ্গ প্রকাশ পেতে লাগল। কেউ বা বলল সে একবার স্বচক্ষে দেখেছে মহানদীতে বন্যার সময়ে মহাকাঞ্চন জলের উপরে পদপাত করতে করতে চ'লে যাচ্ছেন। আর কেউ বলল মহাকাঞ্চন একবার সশরীরেই স্বর্গে গিয়েছিলেন।

॥ ১৮ ॥

মহাসার এতক্ষণ বৃক্ষের পত্রান্তরালে লুকিয়েছিল। কি ভাবে কি ঘটল তা সে সম্যক্ বুঝতে না পারলেও চম্পা যে তার পা ফিরে পেয়েছে এতে সে অত্যন্ত আনন্দিত। সকলের আনন্দ সে নেপথ্য থেকে উপভোগ করছিল। সকলে চলে যেতে সে সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে গৃহাভিমুখী হ'ল। ইরা এই আনন্দের দৃশ্য দেখতে পেল না ভেবে তার মনে দুঃখ হ'ল। কে জানত আজ এখানে এমন অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটবে! ইরা তো সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল, মহাসারকে পাঠিয়েছিল কেবল এই জন্য যে মহাশাল বিফল হলে চম্পা ও তার মাকে সে যেন তৎক্ষণাৎ সঙ্গে করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসে।

এমন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল আজ তো বহু লোক এখানে এসেছে, তারা ঘরে ফেরার সময়ে অনেকেই হয়তো তার বিপণিতে কিছু ক্রয় করতে যাবে। তাই সে ত্বরিত পদে বাড়ী ফিরতে লাগল। হঠাৎ চোখে পড়ল চম্পার পরিত্যক্ত আসাবাড়ি দুইখানি এক পাশে পড়ে আছে। মহাসারের এক স্বভাব সে যৎসামান্য বস্তুকেও তুচ্ছজ্ঞান করে না। এক গাছি সূতা পড়ে থাকতে দেখলে সে তুলে রাখে পরে কাজে আসতে পারে ভেবে। সে যষ্টি দু'খানি কুড়িয়ে নিয়ে চলল।

পথে বৌদ্ধ বিহারের সিদ্ধাচার্য ধর্মপালের সঙ্গে মহাসারের সাক্ষাৎ হ'ল। তিনি অল্পক্ষণ পূর্বে বজ্রগুরুব নিকট হতে তার নির্দেশ নিয়ে ফিরে ভিক্ষুদের প্রমুখাৎ সমুদায় ব্যাপার শুনেছেন। বজ্রগুরুর নির্দেশ এই ছিল যে সোমদত্তের কোনও পুত্র যাতে চম্পাকে আদেশ করতে না পারেন সে জন্য বজ্রগুরু স্বয়ং না আসা পর্যন্ত যেন চম্পাকে সঙ্ঘের মধ্যেই আবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু এর মধ্যে চম্পাকে আদেশ করা ও চম্পার চলৎশক্তি ফিরে পাওয়া সবই হয়ে গেছে দেখে তিনি দুঃখিত হয়েছেন।

Digitized by srujan ka@gmail.com

তিনি আশা করেছিলেন বজ্রগুরুর কৃপায় চম্পা যদি বিহার প্রাঙ্গনেই চলৎশক্তি ফিরে পায় তবে তাঁর সঙ্ঘের মহিমার যশোবর্ধন হবে। তাতে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে তিনি চম্পার আসা দুইখানি আনতে যাচ্ছিলেন, তাঁর গোপন ইচ্ছা এই যষ্টি দুটি সঙ্ঘে রক্ষা ক'রে তিনি প্রমাণ করবেন চম্পা যে বালক মূর্তির দর্শন পেয়েছিল তা তথাগত বজ্রসত্ত্বেরই মূর্তি। তিনি যষ্টিদুখানি চাওয়াতে মহাসার সানন্দে সে দুখানি তাঁকে দিয়ে গৃহে চলে গেল।

ইতিমধ্যে বিনীতা যথাসময়ে সংবাদটি পেয়েছে। তার সত্যাসত্য অবধারণের জন্য সে এক পরিচারিকাকে চম্পার গৃহে পাঠাল। সে সংবাদ নিয়ে ফিরে এসে সমস্ত ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়ে শেষে বলল সে স্বচক্ষে চম্পাকে দৌড়াতে দেখে এসেছে।

সমস্ত শুনে বিনীতা ভাবল মহাকাঞ্চন তবে তার সঙ্গে ছলনা করেছেন, কারণ তিনি গুহ্যসমাজের বৃদ্ধি কামনা করেন না। তাই তিনি নিজে বিনীতার সমাজে এই অলৌকিক কর্ম না ক'রে অন্যত্র এবং অন্যের দ্বারা তা করালেন। বিনীতা ব্যথিতা ও ক্রুদ্ধা হয়ে সঙ্কল্প করল যেমন করেই হোক তার নূতন সমাজকে সে লোকসাধারণে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। সেই উদ্দেশ্যে এখন সেও চম্পার যষ্টি দুইখানির সন্ধান নিল এবং ধর্মপালের নিকটে তা আছে জেনে তাঁকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখল। পত্রে নানা প্রমাণ দেখিয়ে সে যা প্রতিপন্ন করতে চাইল তা এই যে চম্পাকে যিনি বালকবেশে দর্শন দিয়েছিলেন তিনি ভগবান্ তথাগত গুহ্যক, কারণ চম্পা ও চম্পার মাতা তার (বিনীতার) অন্নে প্রতিপালিতা। অতএব যষ্টি দুইটি তার মন্দিরেই রক্ষিত হওয়া উচিত।

উত্তরে ধর্মপাল এক দীর্ঘ পত্রে জানালেন চম্পা ও তন্মাতা তাঁর সঙ্ঘের আর্যানী, চম্পাকে যে মূর্তি দর্শন দিয়েছিলেন তিনি তথাগত বজ্রসত্ত্ব, তিনি (ধর্মপাল) প্রথমে ঘটনাটি শুনে তা বজ্রগুরুকে জানিয়েছিলেন এবং বজ্রগুরুর কৃপাতেই চম্পা এখন তার চলৎশক্তি ফিরে পেয়েছে। অতএব সে যষ্টি দুটিতে তাঁর সঙ্ঘেরই অধিকার।

বিনীতা উৎক্ষিপ্তা হ'ল। সে মনস্থ করল ধর্মপাল যষ্টিদুটি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন, বিনীতা চম্পাকে তার গুহ্যসমাজভুক্তা করবে। শিশুকালাবধি বিনীতার স্বভাব এইরূপ। তার সামান্য ইচ্ছাও বাধাপ্রাপ্ত হ'লে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। সে কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে এক পরিচারিকার হস্তে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা ও বহুমূল্য বস্ত্র চম্পাকে উপহারস্বরূপ পাঠিয়ে আশীর্বাদ জানাল।

॥ ১৯ ॥

চম্পা গৃহে গিয়ে পৌঁছানো মাত্র প্রতিবেশী পল্লীনারীরা—যারা কোনো না কোনো কারণে অলৌকিক ঘটনা সন্দর্শনে যেতে পারেনি—সকলেই চম্পার কাছে এসে

Digitized by srujan ka@gmail.com

জুটল। চম্পাকে বহুবার সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করতে হ'ল, এবং প্রমাণ প্রদর্শন হেতু দৌড়াতে হ'ল। অবশেষে বেচারী একেবারে ভ্রান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ল! পল্লীস্ত্রীগণ তাকে মহাভাগ্যবতী ব'লে অসংখ্য আশীর্বাণী উচ্চারণ করে বারংবার মহাকাঞ্চনের উদ্দেশে তাদের ভক্তিবিনম্র প্রণাম উৎসর্গ করল, তারপর একে একে বিদায় নিল। অনেকে চম্পাকে নানা উপহারাদিও দিল। চম্পা জীবনে কখনও এত বিচিত্র বস্তু, তাও একসঙ্গে, দেখেনি। তার চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হ'ল।

এমনি আনন্দ উত্তেজনার মধ্যে সারা দিন কেটে গেল। ক্রমে রাত্রি হ'লে চম্পা খেয়ে উঠে তার মধুকাকার কাছে ব'সে নাটক শুনতে চাইল। চম্পার মা তখন শুয়ে পড়েছে। মধুকরের বুঝতে বাকি রইল না যে চম্পা তার পা ফিরে পেয়ে এখন চন্দ্রকে ফিরে পাবার কথা ভাবছে। সে তার কাঞ্চনকুমারী নাটক থেকে প্রেমের কবিতা ও দৃশ্য প'ড়ে শোনাতে লাগল। চম্পাও শুনতে লাগল। কিন্তু মধুকর লক্ষ্য করলে দেখতে পেত চম্পার মন যেন কারও আগমন প্রতীক্ষায় চঞ্চল। বিদেহ রাজ্যের রাজকুমার যখন কাঞ্চনকুমারীর সঙ্গে গোপনে সাক্ষাতের নিমিত্ত নানা বিপদ অতিক্রম ক'রে আসছেন তখনই চম্পা হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে উৎকর্ণ হয়ে কি শুনতে চেষ্টা করল। শুনতেও পেল। তখন সে তার মধুকাকার কানে কানে কিছু বলল।

মধুকর হেসে আড়ালে চ'লে গেল। চম্পা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গবাক্ষর নিকটে গিয়ে অনুচ্চ স্বরে ডাকল—চন্দ্র...!

—চম্পা...! চন্দ্র গদ্‌গদ স্বরে উচ্চারণ করল।

—প্রিয়তম...

—প্রিয়ে...

মনুষ্য সৃষ্টি অবধি যুবক-যুবতী মিলনের আনন্দে এইরূপ কত অনাবশ্যক তবু আবশ্যক, নিরর্থক তবু সার্থক কথা ব'লে একে অন্যের আনন্দবর্ধন করে এসেছে। মিলন বর্ণনায় তার পুনরাবৃত্তি করে লাভ নেই। যে শক্তি পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায় সে শক্তি হয়তো ভগবান, কিন্তু মূক যুবক-যুবতীকে যে শক্তি বাচাল করে তা এই শক্তি—যা আজ রাত্রে এইখানে প্রকাশিত! চন্দ্র কিছু বিদ্যা শিক্ষা করেছে, সে এখন উপার্জনক্ষম, এখন সে চম্পাকে জীবনসঙ্গিনী করবার ক্ষমতা রাখে—এমনি অনেক কথা সে অনর্গল বলে গেল। চম্পার অসম্ভব স্বপ্ন আজ ভগবৎ কৃপায় আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্যভাবে সফল হয়েছে, সেও আনন্দে অশ্রু মার্জনা করতে করতে কত কিছু ব'লে গেল।

চন্দ্র গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলল,—চম্পা, দাও ভেঙ্গে দাও এটাকে—ভেঙ্গে ফেল...!

এই উন্মাদনা—সৃষ্টির নিয়মে পুরুষের বীজ রপনই বোধহয় আদি কাল হ'তে

Digitized by srujan ka@gmail.com

এর একমাত্র লক্ষ্য। এই শারীর সৃষ্টিতে পুরুষের যে স্থান, মানস সৃষ্টিতে সেই স্থান নারীর—এমন চিন্তা করেছেন এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ চিন্তক। শারীর সৃষ্টিতে যেমন তার ধারণা ও বিকাশের নিমিত্ত আপন ধৈর্য ও সমাজের শৃঙ্খলার প্রয়োজন, মানস সৃষ্টিতে তেমনই পুরুষের চিত্তে নারীর প্রেরণার বীজ বপনের নিমিত্তও সমাজে সেই শৃঙ্খলার প্রয়োজন। সকলের অলক্ষ্যে চিরকাল কোনও বড় চিন্তার পিছনে, আবিষ্কারের পিছনে, এমনকি বড় ত্যাগের পিছনে রয়েছে কোনও নারীর প্রেরণা। চম্পা এত কথা জানে না, তবু তার নারীসুলভ সহজাত বুদ্ধিতে সে জানে—বা প্রকৃতি স্বয়ং তাকে বলে তার অব্যক্ত ভাষায়—পুরুষের এ কামনাকে শৃঙ্খলিত বা সুনিয়ত করার দ্বারাই এই উভয়মুখী বীজ বপনের চরম কল্যাণ উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

—গবাক্ষ ভঙ্গের সময় এখনো আসে নি, চন্দ্র। আর একটু ধৈর্য ধর।

—তাহলে তোমার হাত দাও আমার হাতে—বড় অস্থির হয়ে বলল চন্দ্র। চম্পার দুইখানি সডৌল সুগৌর হাতে চন্দ্র অধীর আগ্রহে চুম্বনের পর চুম্বন করতে লাগল।

চম্পাও প্রায় ধৈর্য হারা, তবু সে অবশেষে তার হাতখানি মুক্ত ক'রে নিয়ে মধুর হেসে বলল,—তোমার ধৈর্য নেই!

—আমার সব ধৈর্য তুমি কেড়ে নিয়েছ...!

এ কথায় চম্পার মুখে হঠাৎ এক দুষ্ট হাসি ফুটে উঠল, বলল,—তবে তুমি যাও বরং তোমার সেই যে তিনি অপেক্ষা ক'রে আছেন—

চম্পার কথা শেষ না হতেই চন্দ্র এক প্রকার মধুর কপট আক্রোশে চম্পাকে চপেটাঘাত করতে চাইল, আপাততঃ গবাক্ষ বেচারীকেই তা সহ্য করতে হ'ল!—সে আমার কে? কেউ না। কালো—কুৎসিত—কদাকার, তাকে আমি কখনো বিবাহ করব না।

চম্পা বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু আমি যদি ভাল হয়ে না উঠতাম? কিন্তু আত্মসংবরণ ক'রে বলল,—অন্যায় বলছ চন্দ্র, সে কালো, আর উদ্দন্তরীও বটে, তদুপরি বসন্তগুটিকা-কলঙ্কিতা, কিন্তু সে কুৎসিতা নয়, সে সুগঠিত। আর কালো হ'লেও সে বড় ভাল, তোমার বাবা তাকে পছন্দ ক'রে কিছু ভুল করেননি।

—তাহলে বাবাই তাকে ঘরে—ব'লে চন্দ্র তার অসংযত বাক্য অসমাপ্ত রেখে করুণ মিনতি ক'রে বলল,—চম্পা, তুমি আমাকে আর কষ্ট দিও না। আজ সকালে মন্দিরে তোমায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবধি আমি সব ধৈর্য হারিয়েছি। এখন পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

সকালের কথা হঠাৎ অতি স্পষ্টভাবে মনে পড়ল চম্পার, সেই অদ্ভুত আশ্চর্য স্মৃতির প্রাবল্যে সে ক্ষণেকের তরে আত্মহারা হ'ল। বলল,—ওঃ সত্যি, আজ সকালে—সে যে কি—কেমন ক'রে কি যে হ'ল বলতে পারি না! দৌড়াতে দৌড়াতে

Digitized by srujan ka@gmail.com

গিয়ে তার কোলে যখন গিয়ে পড়লাম তখনই শেষে আমি বুঝলাম যে আমার পা ফিরে পেয়েছি!

—ওঃ, তুমি যখন দৌড়াচ্ছিলে তখন তোমায় স্বর্গের অপ্সরার মত লাগছিল!

এই সময়ে মধুকর এসে বলল,—চম্পা, মা ডাকছে।

চম্পা চন্দ্রর কাছে বিদায় নিয়ে শয্যায় গিয়ে অশ্রুমার্জনা করতে করতে এক সময়ে নিদ্রামগ্ন হ'ল।

॥ ২০ ॥

বিনীতা কিছুদিন মধ্যে মধ্যে চম্পার নিকট নানা বহুমূল্য উপহার পাঠাবার পর একদিন তাকে নিজের গুহ্য-সমাজে আসবার জন্য সংবাদ পাঠাল।

বিনীতা একবারই মাত্র চম্পাকে দেখেছিল। তার চলৎশক্তি ফিরে পাবার পর আজ এই প্রথম তাকে আবার দেখল। দেখল এই অল্পকালের মধ্যে তার রূপ যেন শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। চম্পার সে ভুবনমোহন রূপ দেখে বিনীতা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কিন্তু ক্রমে সেই দৃষ্টিতে ফুটে উঠল এ কিসের জ্বালা! বিনীতা নিজের কথা স্মরণ করল। তারও এক দিন এমন ভুবনমোহন রূপ ছিল। সে রূপ, সে সৌন্দর্য আজ পর্যুষিত পুষ্পের মত ম্লান। কেন? সে পুষ্পকে সে একদিন অন্তরের আনন্দোচ্ছল আবেগে উৎসর্গ করতে গিয়েছিল তার প্রিয়তম, তার অন্তরের দেবতাকে। কিন্তু সে পাষাণ মনুষ্য-দেবতা —সে পুষ্প পদতলে দলিত ক'রে চ'লে গিয়েছিলেন। সে ফুল আজ অনাদরে ঝরে গেছে। আজ তেমনই আর একটি ফুল দেখে বিনীতার গূঢ় প্রবৃত্তি চাইল তাকে দলিত, বিমর্দিত করতে। আর কোনও ইচ্ছা নয়, অভিলাষ নয়, চিন্তা নয়—কেবল এই একমাত্র চিন্তাতেই সে অবশেষে একটা বিকৃত আনন্দ অনুভব করতে লাগল।

বাহিরে নিজেকে সংযত ক'রে বিনীতা চম্পাকে আদর ক'রে নানা কথা জিজ্ঞাসা করল। চম্পা সাহস পেয়ে তার জীবনের বৃত্তান্ত বলতে লাগল। অবশেষে যখন সে চন্দ্রের কথা বলল, বিনীতার অধরে তখন এক মৃদু, অতি ক্রূর হাসি দেখা দিল।

সব শুনে বিনীতা বলল,—চম্পা, যে বালক তোকে দেখা দিয়েছিলেন সেই বালক কে জানিস্? তিনি স্বয়ং তথাগত গুহ্যক। তাই বলছিলাম—

বলতে বলতে বিনীতা হঠাৎ থেমে গেল। বুদ্ধিমতী বিনীতা দেখল চম্পার হঠাৎ একথা বিশ্বাস হ'ল না, সে মুখভাব লুকাবার জন্য মাথা নিচু করছে। বিনীতা তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গান্তর ক'রে বলল,—মহাকাঞ্চন যোগী, কিন্তু তিনি ভুল মার্গে চলেছেন। তাই তাঁর মনে পরিবর্তন আনার উদ্দেশ্যে তথাগত গুহ্যক মহাকাঞ্চনকে প্রথমে এই কার্যে ব্যর্থ ক'রে পরে মহাসারের মধ্য দিয়ে তাঁকে সফল করালেন, যাতে তিনি নিজের

Digitized by srujan ka@gmail.com

ভুল বুঝতে পারেন। এ কথায় চম্পার সরল মনের সংশয় দূর হ'ল, সে বিনীতার পাদস্পর্শে করে প্রণাম করল।

বিনীতা চম্পাকে আশীর্বাদ ক'রে বলল,—যে তথাগত গুহ্যকের কৃপায় তুই আজ তোর পা দু'খানি ফিরে পেয়েছিস্ তাঁকে তোর জীবন উৎসর্গ করা উচিত।

চম্পার বুক কেঁপে উঠল। এ কেমন কথা! তার সুন্দর মুখখানি কালিমালিপ্ত হ'ল। মিনতিভরা কণ্ঠে সে বলল,—দেবী, চন্দ্র তাহ'লে আত্মহত্যা করবে। আমিও তাকে না দেখলে বাঁচব না।

বিনীতা অধর দংশন ক'রে কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর বলল,—আমি তোকে জোর করে কিছু করতে বলছি না, চম্পা। কেবল তোর কি করা উচিত তাই বলছিলাম। তোর এই প্রেম যদি তুই তথাগত গুহ্যককে সমর্পণ করিস্ তাহ'লে তোর মঙ্গল হবে।

সেদিন বিনীতা চম্পাকে আর বিশেষ কিছু বলল না। তবে প্রত্যহ তাকে সংবাদ দিয়ে সমাজে এনে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে নানা কথাবার্তা বলতে লাগল এবং তার মধ্যে কখনও বা গুহ্যকের মহিমা বর্ণনা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে যে সুখিপল্লীতে প্রচার ক'রে দিল যে চম্পা তথাগত গুহ্যকের কৃপায় তার চলৎশক্তি ফিরে পেয়েছে এবং চম্পার এখন উচিত তাঁকেই তার জীবন সমর্পণ করা। পল্লীবাসিগণ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—বাস্তবিক, এ কত বড় আদর্শ সমাজকর্ত্রী বিনীতা স্থাপন করলেন চম্পার সামনে, চম্পা ভাগ্যবতী। তারাও চম্পাকে সেই উপদেশ দিতে লাগল। বিশেষতঃ পল্লীর যুবকেরা চম্পার মাকে এ বিষয়ে প্রবর্তনা দিতে আগ্রহী দেখা গেল।

এদিকে ধর্মপালও চম্পাকে ভিক্ষুণী করবার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ সকালে তাকে ডাকিয়ে এনে তার কাছে বহুক্ষণ ধরে বজ্রগুরুর মহিমা বয়ান করতে লাগলেন। তেমনি আবার সোমদত্ত প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে চম্পাকে ডাকিয়ে এনে তাকে নানা শাস্ত্র-প্রমাণ দেখিয়ে বোঝাতে লাগলেন যে সেই বালক স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু। সোমদত্ত সেই পরিত্যক্ত মন্দিরে একটি বিষ্ণু বিগ্রহ স্থাপনা ও নিত্য তাঁর পূজার্চনার নিমিত্ত অনুমতি ও কিঞ্চিৎ সম্পত্তির জন্য প্রাদেশিক সুভদ্রদেবের নিকট আবেদন জানালেন। এইরূপে চম্পার প্রায় সারাদিন নানা ধর্মোপদেশে শুনে কাটতে লাগল। বিনীতা এ সব অবগত হ'ল।

চার পাঁচ দিন যাবৎ চম্পা প্রত্যহ বিনীতার নিকট আসার পরে বিনীতা একদিন বলল,—চম্পা আমার ইচ্ছা তুই কিছুদিন আমার এই সমাজেই থাক্। অল্পকালের জন্য এখানে থাকতে চাইলে চন্দ্র নিশ্চয় আপত্তি করবে না।

বিনীতার নানা বহুমূল্য উপহার ও আদরে চম্পা অতিশয় কৃতজ্ঞ, সে বিনীতার কথা অমান্য করতে পারল না। তাছাড়া, সে নিজেও চাইছিল চন্দ্রর প্রেমকে আরও

Digitized by srujan ka@gmail.com

ঘনীভূত করার জন্য কিছুদিন সে চন্দ্রর থেকে দূরে থাকে।

বিনীতা চম্পাকে খুবই আদর যত্নে রাখল। তারপর কথা প্রসঙ্গে বিনীতা একদিন বলল,— চম্পা, আমাকে দেখ্, আমি আমার জীবন তথাগতকে সমর্পণ করে দিয়েছি তোর বয়স থেকেই। পুরুষেরা স্বার্থপর, হৃদয়হীন। বিবাহে তাই কোনো সুখ নেই, পরিণামে কেবলই দুঃখ। বিবাহ করলে পরে তুই অনুতাপ করবি।

চম্পা বলল,—না দেবী, চন্দ্র সেরকম নয়। বিশেষ আমি মনে মনে তাকে পতি ব'লে বরণ করেছি।

বিনীতা তথাপি বলল,—তথাগত গুহ্যক্‌কে তুই স্বামী ভাবে পাবি, চিরকাল তোর নাম থাকবে। তাঁকে ছেড়ে তুই সামান্য...

চম্পা বিনীতার পায়ে প'ড়ে বলল,—দেবী, অমন কথা বলবেন না। আমি তা পারব না। আমি সামান্যা নারী, আমার সে ক্ষমতা নেই। এ পাপিনীর কথা আপনি তাঁর কাছে বলবেন, তিনি নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করবেন।

বিনীতার দুই চোখ জ্বলে উঠল। সে বার বার অধর দংশন করতে লাগল। তাকে দেখে চম্পা ভয়ে কম্পিত হ'ল। অশ্রুজল মার্জনা করতে করতে সে বলল,— দেবী, আমায় এখান থেকে চ'লে যেতে অনুমতি করুন, আমার এখানে মন লগছে না।

বিনীতা বলল,—কেউ তোকে এখানে বেঁধে রাখেনি, চম্পা। আমি তোর মঙ্গলের জন্যই কেবল বলছিলাম। আমার অন্তে এই সমাজের কর্ত্রী হবি তুই। এ সমস্ত সম্পত্তি তোর। একটা দরিদ্র নগণ্যকে বিবাহ করে কি লাভ? এ সমস্ত ভাল ক'রে চিন্তা করে দেখ্। তার পরে তোর যা ইচ্ছা হয় করিস্।

চম্পা নতমুখ হয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর মুখ তুলে সন্ত্রস্তভাবে বলল,— দেবী—

বিনীতা আশান্বিতা হয়ে বলল,—বল্ তোর ইচ্ছা কি।

চম্পা নতজানু থেকেই আপ্রাণ সাহসে ভর করে বলল,—দেবী—আমি—আমি ঘরে যেতে চাই।

বার বার ব্যর্থ হয়ে বিনীতা একান্ত উৎক্ষিপ্তা হয়েও স্থির রইল। অন্তরে তার সঙ্কল্প দৃঢ়তর হ'ল। সে উঠে গিয়ে কিয়ৎক্ষণ অন্যত্র দণ্ডায়মান হয়ে চিন্তা করতে লাগল। অবশেষে এক উপায় তার মনে এল। ফিরে এসে চম্পাকে গৃহতল হ'তে তুলে সে বলল,—আচ্ছা, তুই যা। এখানে আসতে কিন্তু ভুলিস্ না। তোর যখন যেমন প্রয়োজন হবে আমাকে বলবি, কেমন?

চম্পা সানন্দে বিদায় নিল।

তখন বিনীতা মহাশালকে একখানি পত্র লিখতে বসল।

Digitized by srujan ka@gmail.com

মহাশাল কলিঙ্গ সেনাদলে যোগ দেবার পূর্বে সুখিপল্লীর অরণ্যে যখন অস্ত্রচর্চা করত সেই সময়ে সে একদিন মহানদী-তীরে বিচরণরতা বিনীতাকে দেখে মুগ্ধ হয়। মহাশাল তখন অষ্টাদশ বর্ষীয় নবযুবক। বিনীতার বয়ঃক্রম দ্বাদশ, কিন্তু তখনই সে উদ্ভিন্নযৌবনা। মহাশাল তখন কেবল এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান। বিনীতা প্রাদেশিকের কন্যা, রাজপুত্রী সমানা, তথাপি একদিন মহাশাল মহানদী-তীরে বিনীতার সাক্ষাৎকামী হয়ে তার সান্ধ্যভ্রমণের পথে তার সম্মুখীন হ'ল। তার উদ্দেশ্য অনুমান করে বিনীতা সগর্বে বলল,—পথ ছাড়। তোমার আশা ও সাহস নির্বোধের উপযুক্ত, তাই তুমি বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাইছ। আজ তোমায় ক্ষমা করলাম, ভবিষ্যতে সাবধান হয়ো। মহাশাল স'রে দাঁড়াল। বিনীতা তার দিকে দৃক্‌পাত না করে চ'লে গেল।

সেদিনের অপমান মহাশাল ভুলতে পারেনি। পরে যখন সে জানল যে বিনীতা মহাকাঞ্চনকে প্রেমার্পণ করেছে তখন সে মহাকাঞ্চনের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হ'ল। মহাকাঞ্চন বিনীতার প্রেম প্রত্যাখ্যান ক'রে যোগশিক্ষা করতে বিদেশে চ'লে গেল। ফলে মহাশাল আবার বিনীতার নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করতে লাগল। তার লক্ষ্য হ'ল আপন বাহুবলে আপন গৌরব বৃদ্ধি ক'রে সে বিনীতার প্রেমপ্রার্থী হবে। বিগত বারো বৎসরে বহু ঘটনা ঘটে গেছে। এতদিন সে বিনীতার কোনও সংবাদ পায় নি। সুখিপল্লীতে ফিরে সে যখন দেখল বিনীতা ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করেছে তখন সে তাকে পাবার সমস্ত আশা ত্যাগ করল। এই সময়েই সে চম্পার ভগবদ্দর্শনের কথা শুনতে পেল। সেই সূত্রে চম্পাকে আদেশ দানের ব্যাপারে মহাকাঞ্চনের ব্যর্থতার পরে মহাশালের পুনর্বার আশার সঞ্চার হ'ল। সে ভাবল, সে যদি আদেশ দেয় এবং তাতে চম্পা তার পাদশক্তি ফিরে পায় তাহ'লে বিনীতা তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু সে আশাও অতি হাস্যকর ভাবে বিফল হ'ল। তাই মহাশাল সেদিন সুখিপল্লী ত্যাগ করে রাজধানী কলিঙ্গনগরে ফিরে যাবার উদ্‌যোগ করছিল, এখন সময়ে বিনীতার পত্র পেয়ে তার ভগ্ন আশা আবার অঙ্কুরিত হ'ল।

মহাশাল এসে প্রবেশ করতে বিনীতা তাকে বহুমূল্য আসনে বসিয়ে মধুর বচনে বলল,—'আমি আপনার কীর্তিকাহিনী শুনেছি। যে বীর নিজ বাহুবলে এত উচ্চ সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং স্বয়ং মহারাজের প্রিয়পাত্র হয়েছেন তাঁকে সাক্ষাতে দেখবার ইচ্ছা আমার বহুদিনের, কিন্তু সাহস ক'রে কখনো তা আপনাকে জানাতে পারিনি। আপনি অচিরে এ স্থান ত্যাগ করে রাজধানীতে চ'লে যাচ্ছেন জেনে আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আপনাকে এখানে আহ্বান করেছি, আমায় ক্ষমা করবেন।

মহাশাল অতিশয় আহ্লাদিত হয়ে গোরধগিরির যুদ্ধ, রাজা সাতকর্ণির সহিত যুদ্ধ

Digitized by srujan ka@gmail.com

প্রভৃতি যুদ্ধে আপন বীরত্বের কথা সালংকারে বর্ণনা করে বলতে লাগল। শেষে বলল,—দেবী, বিনীতা, আমি নিজেই তোমার নিকট আসতাম, কিন্তু—কিন্তু—

মহাশাল কি বলতে চাইছে তা বুঝতে বিনীতার বাকী রইল না। প্রসঙ্গ সুগম করবার জন্য সে বলল,—আমার আজ মনে পড়ে যুবক মহাশালের কথা, বিশাল ধনুঃশর স্কন্ধে নিয়ে যে একদিন এই সুখিপল্লীর বনে বনান্তরে ভ্রমণ করত........

মহাশাল এবার সাহসপূর্বক বলল,—কিন্তু সেইদিন থেকেই আমি নিঃসঙ্গ, বিনীতা।

বিনীতা ঈষৎ হেসে বলল,—আপনি বীর। কে বলতে পারে নিকট ভবিষ্যতে হয়তো আপনার নিঃসঙ্গতা দূর হতে পারে।

মহাশাল অধীর হয়ে বিনীতার একটি হাত ধরে গাঢ়স্বরে বলল,—দেবী—বিনীতা—

বিনীতা আপন হাত মহাশালের মুষ্টি থেকে মুক্ত করে নিয়ে কিঞ্চিৎ দূরে সরে গিয়ে বলল,—আমি বলছিলাম, আপনার পদমর্যাদা, আপনার যশঃ দেখে কোন নারীই বা আপনাকে পতিরূপে পেতে ইচ্ছা না করবে। কিন্তু সে কথা পরে। আপাততঃ আমি আপনার কাছে একটি উপকার প্রার্থনা করছি।

—আদেশ কর, বিনীতা।

—আপনি সুখিপল্লী নিবাসী শিবির পুত্র চন্দ্রকে হয়তো জানেন?

—হ্যাঁ, জানি।

—সে সুস্থ সবল যুবক, কিন্তু অতি দরিদ্র। তাকে কলিঙ্গ সেনাদলভুক্ত করে নিতে আপনার কোনো আপত্তি হবে কি?

—না। এ তো অতি সামান্য কথা। কিন্তু তাতে তোমার লাভ?

—কিছু না। তার পিতা আমায় বহুবার অনুরোধ করেছে—কেবল এই। যদি আমার দ্বারা তার কিছু উপকার হয় ক্ষতি কি?

মহাশাল একটু ভেবে বলল,—বিনীতা, ক্ষমা কর, এতে আমার প্রত্যয় হচ্ছে না। সামান্য কৃষক রাজপুত্রীর সাক্ষাৎ পাওয়া কি করে সম্ভব। যদি বা সাক্ষাৎ পায় এ অনুরোধ করবার সাহস তার হবে না। তবে সে যাই হোক, আমি শুনেছি চম্পার সঙ্গে শীঘ্রই চন্দ্রর বিবাহ হবে। অতএব—

বিনীতা বুঝল তার মনোগত ইচ্ছা আর গোপন ক'রে লাভ নেই। মৃদু হেসে বলল,—আপনি সমস্ত কথাটি জানেন না। চম্পার তাকে বিবাহ করবার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু এখন আর নেই। চম্পা উপলব্ধি করেছে যে ভগবান তথাগত গুহ্যকের কৃপায় সে তার পদদ্বয়ের শক্তি ফিরে পেয়েছে। তাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে তার সমস্ত জীবন তথাগতকেই সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। আমিও তাকে এই সমাজের অধিকারিণী করে দিয়ে নিজে বিবাহ করতে চাই। কিন্তু চন্দ্রই আমার ও চম্পার পথের কন্টকস্বরূপ

Digitized by srujan ka@gmail.com

হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই—

মহাশাল সহাস্যে বলল,—বিনীতা, এই সামান্য ব্যাপারের জন্য চিন্তা করো না। আমি চন্দ্রকে এ জগৎ হ'তে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেব। কারণ চন্দ্র জীবিত থাকতে চম্পার মনের প্রকৃত পরিবর্তন হবে না। তোমার মহৎ উদ্দেশ্যে সে যদি অন্তরায় হয় তবে সে বেঁচে থাকতে পারে না।

বিনীতার অন্তর কম্পিত হ'ল। সে বলল—না না, আমি তা চাই না। আপনি তাকে এখান থেকে দূরে নিয়ে গেলেই আমার উদ্দেশ্য সাধিত হবে। চন্দ্রের পিতা শিবি বড় দরিদ্র। চন্দ্রেরও কোনও উপার্জন নেই। শিবিকে যদি এ প্রস্তাব দেওয়া যায় তাহলে সে সানন্দে রাজি হবে। চন্দ্র নিজে হয়তো হঠাৎ রাজি না হতে পারে। সে জন্য তাকে বোঝাতে হবে, প্রলোভন দেখাতে হবে।

—তুমি নিশ্চিন্ত থাক, বিনীতা। এ অতি সামান্য কথা।

মহাশাল গৃহে ফিরে শিবিকে সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করল। শিবি এসে মহাশালের প্রস্তাব শুনে আহ্লাদিত হয়ে তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিল। চন্দ্র যে কখনও এ গৌরব ও ধন উপার্জনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে এমন আশা সে কখনও করেনি। এরপর মহাশাল চন্দ্রকে তার কাছে আনিয়ে নানা প্রলোভন দেখাল, কিন্তু চন্দ্র আদৌ সম্মত হ'ল না। শেষে মহাশাল ভয় প্রদর্শন করলে তাতেও সে ভীত হ'ল না।

পরদিন এ বিষয় বিনীতাকে জানাতে মহাশাল আবার গুহ্যক সমাজে এল। বিনীতা সমস্ত শুনে বিরক্ত হয়ে বলল,—ফল কথা, আপনি ব্যর্থ হয়েছেন। আপনার সহিত আর আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আপনার ব্যর্থতার সঙ্গে আমার মনোরথও বিফল হয়েছে। ভেবেছিলাম—

মহাশাল দেখল তার বহুদিনের আশা ও অভিলাষ এক সামান্য কারণে বিফল হতে চলেছে। সে এবার স্থির দৃষ্টিতে বিনীতার দিকে চেয়ে ব'লে উঠল,—বিনীতা, আমি যে কোনও উপায়ে পারি তোমার ইচ্ছা অবশ্য পূরণ করব।

এক ক্রূর সঙ্কল্প নিয়ে মহাশাল গৃহে ফিরে এল। বিনীতা অতি বুদ্ধিমতী, সমস্ত বুঝতে পেরেও আর বাধা দিল না।

॥ ২২ ॥

সেইদিন সন্ধ্যায় চম্পা বিনীতার নিকটে এল। তার মলিন মুখ ও সাশ্রু নয়ন দেখে বিনীতা অনায়াসেই অবস্থা অনুমান করল। তবু জিজ্ঞাসা করল,—কি হয়েছে, চম্পা?

চম্পা সরোদনে বললে,—দেবী, আপনি বলেছিলেন আবশ্যক হ'লে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করতে। আমার আজ চরম বিপদ উপস্থিত, দেবী!

Digitized by srujan ka@gmail.com

বিনীতা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তার অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞাসা করল। চম্পা তখন চক্ষু মার্জনা করে বলল,—চন্দ্রের পিতা চন্দ্রকে সৈনিক হবার জন্য নির্বন্ধ করছেন—আপনি দয়া করে এর প্রতিকার করুন।

বিনীতার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হ'ল। সে বলল,—চন্দ্রর এ তো পরম সৌভাগ্য! আমি তো এতে তার মঙ্গলই দেখছি। তা ছাড়া চন্দ্র যে সেই ধনিকন্যাকে বিবাহ করবার জন্যই তোকে এই সব কথা বানিয়ে বলছে না তাই বা তুই কি করে জানলি? এমনি ছলনা করে সে তোকে ত্যাগ করতে চায়। সব পুরুষই এমনি।

—না, না, দেবী! আমি জানি সে ছলনা করছে না। আমার অন্তর বলছে সে আমায় ভালবাসে। দেবী, আপনি আমার হৃদয়ের কথা কি করে জানবেন? চন্দ্র বিনা আমি বাঁচব না।

বিনীতার দুই চক্ষু জ্বলে উঠল। সে বলল,—প্রেমের জন্য কেউ কখনও মরে যায়নি, চম্পা।

বিনীতার পদতলে লুটিয়ে চম্পা বলল,—দেবী, আপনি আমাদের রক্ষা করুন। এ জগতে আমার কেউ নেই। আপনি যদি জানতেন চন্দ্রর মুখে এ কথা শোনা অবধি আমি কি যন্ত্রণা পাচ্ছি... চন্দ্র যদি চ'লে যায় তথাগত গুহ্যক তবে আমার পা ফিরিয়ে দিলেন কেন!...

আপন পদযুগল মুক্ত ক'রে নিয়ে বিনীতা বলল,—নির্বোধ, চন্দ্রের অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম স্বামী তুই পাবি।

—দেবী, আমি চন্দ্র ছাড়া আর কাউকে চাই না। সে যখন আমার হাত দু'খানি ধরে হেসে কথা বলে, আমার কাছে স্বর্গসুখ তুচ্ছ হয়ে যায়। আমি শুধু চাই যুগ যুগান্ত ধ'রে যেন এমনি ক'রে তার মনের এক কোণে স্থান পাই!...

চম্পা আর বলতে পারল না, ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

চম্পার এই মর্মস্পর্শী আবেদন বিনীতার সর্বশরীরে এক শিহরণ তুলল। এ নারীর সেই চিরন্তন আবেদন। তার নিজের এই চরম আবেদন ব্যর্থ হয়েছিল। এ আবেদন কি কেবল হৃদয়াবেগ ও দেহকামনার প্রতীক না সৃষ্টির দুর্বার আহ্বান? না সব মিলে মিশে এক দুর্জ্ঞেয় দুর্দমনীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ?

বিনীতার হৃদয় মথিত হয়ে অশ্রু নির্গত হ'ল। চম্পাকে তুলে কোলে নিয়ে সে বলতে লাগল,—চম্পা, আমায় ক্ষমা কর্, বোন! আমি পাপিনী! আমার ব্যর্থ নারীত্ব তোর উপরে তার শোধ তুলছিল।

গৃহতলে ব'সে প'ড়ে বিনীতা দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। চম্পা তাই দেখে অধীর হয়ে বিনীতার পদধারণ করে বলতে লাগল, দেবী, শান্ত হোন— দেবী... ! অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে বিনীতা বলল,—চম্পা, ভাবিস্ না, তুই চন্দ্রকেই বিবাহ

Digitized by srujan ka@gmail.com

করবি। আমায় একটু ভাবতে দে।

বিনীতা ভাবতে লাগল এখন উপায় কি। চম্পাকে নিজের গুহ্যক সমাজে নিয়ে আসার জন্য সে যে জাল বিস্তার করেছে এখন তা গুটিয়ে আনবে কি ক'রে। মহাশালকে হয়তো তার নিষ্ঠুর প্রস্তাব থেকে সে নিবৃত্ত করতে পারবে, কিন্তু পল্লীবাসীরা যে তারই প্ররোচনায় এখন চম্পাকে তথাগতের উদ্দেশে উৎসর্গ করতে বদ্ধপরিকর। বিনীতা যদি তাকে নিজের সমাজে স্থান না দেয় তো তারা নিরস্ত না হয়ে ধর্মপালের সঙ্ঘের কাছে অর্পণ করবে। জনসাধারণের অন্ধ বিশ্বাস একবার জাগরিত হলে তা ক্রমশঃ ক্রূর আকার ধারণ করে বিনীতার তা অজানা নয়। তা ছাড়া সে আগে আপনা হ'তে ব'লে এখন বারণ করতে গেলে লোকে নানা সন্দেহ করতে পারে। এমনকি মহাশালও বিফলমনোরথ হয়ে নানা বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে। সর্বোপরি, চম্পা যদি কোনো বাধা না মেনে চন্দ্রকে বিবাহ করে তবে লোকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তাদের উপরে নানা উপদ্রব করতে পারে। অবশেষে এই জটিল পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের একটি মাত্র উপায় বিনীতার মনে এল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিনীতা চম্পাকে জিজ্ঞাসা করল,—চম্পা, চন্দ্র ঘোড়ায় চড়তে পারে?

—হাঁ, দেবী।

—তবে তুই যা, তোর মধুকাকাকে এখনই ডেকে নিয়ে আয়।

চম্পা হয়তো কিছু অনুমান করল, তৎক্ষণাৎ গিয়ে মধুকরকে ডেকে আনল। ভাগ্যক্রমে মধুকর গৃহেই ছিল। তার সঙ্গে বিনীতার বহুক্ষণ যাবৎ গুপ্ত পরামর্শ হ'ল। বিনীতা বলল,—চন্দ্র ও চম্পাকে বহু দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে হবে, এমনকি কলিঙ্গের বাহিরে। সমগ্র কলিঙ্গও সে দুইজনের পক্ষে নিরাপদ নয়। কারণ, মহাশাল ক্রূরকর্মা, চন্দ্রই পথের কণ্টক বিনীতার সেই পূর্ব ইঙ্গিত অনুসারেই সে অবশেষে চন্দ্রের জীবন নাশ করতে পারে।

মধুকর চিন্তিত হ'ল। কিন্তু কোনও উপায় দেখতে পেল না। কলিঙ্গের বাহিরে যাওয়ার অর্থ প্রকৃতপক্ষে ভারতেরও বাহিরে যাওয়া, কারণ কলিঙ্গরাজ খারবেলের সাম্রাজ্য ও প্রভাব সুদূরবিস্তৃত। অস্থির চিত্তে ভাবতে ভাবতে অবশেষে হঠাৎ বন্ধু পেরিপ্লাসের কথা মধুকরের স্মরণ হ'ল। মনে পড়ল যে পেরিপ্লাস সে সময়ে কলিঙ্গের দক্ষিণ সমুদ্রে পালুর নামক এক পোতাশ্রয়ে রয়েছে, কিছুদিনের মধ্যেই সেখান থেকে কম্বুদ্বীপ যাত্রা করবে ব'লে সংবাদ পাঠিয়েছে। এও জানিয়েছে যে পালুরে সে মধুকরের আগমন প্রতীক্ষায় আছে। অনেক পরামর্শের পরে স্থির হ'ল যে চন্দ্র ও চম্পাও মধুকরের সঙ্গে কম্বুদ্বীপ চ'লে যাবে।

Digitized by srujan ka@gmail.com

মধুকর তখন চম্পাকে ডেকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলল,—'মা, কুমারী দেবী ও আমার মত এই যে এখন তোদের দুইজনের কলিঙ্গ রাজ্যে থাকা নিরাপদ নয়। আমার বন্ধু পেরিপ্লাসের কথা তো তোকে অনেক বলেছি। সে এখন পালুর বন্দরে আছে, আমি গেলে সে আমাকে নিয়ে কম্বুদীপ যাত্রা করবে। আমি ভাবছি তোরা দুজনে আমার সঙ্গে কম্বুদ্বীপে চল্, সেখানে বিধি যদি নিতান্তই বাম না হয় তোরা সুখেই বসবাস করবি। তবে পালুর এখান থেকে বহুদূর, পথও অরণ্যসঙ্কুল, তোর সাহস হচ্ছে তো মা?

চম্পা সোৎসাহে বলল,—মধুকাকা, সে সুন্দর দেশের কথা আমি তোমার কাছে কত শুনেছি। চন্দ্র আমার সঙ্গে থাকলে আমি কোথাও যেতে ভয় পাই না। কিন্তু কাকা, মাকে ছেড়ে যাব কি করে? তুমি মাকেও সঙ্গে নেবে তো?

মধুকর বোধহয় এটা প্রত্যাশাই করেছিল। হেসে বলল,—তাই হবে মা, তোর মা সঙ্গে যাবে। কিন্তু চন্দ্র যেতে সম্মত হবে তো?

চম্পা সলজ্জে বলল,—চন্দ্র আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।

বিনীতা অভিভূতার মত চম্পাকে নিরীক্ষণ করছিল। এখন চম্পাকে কোলে টেনে নিয়ে বলল,—তবে তোরা প্রস্তুত হ গিয়ে। তুই আজ আমার এখানেই থাকবি। আজ রাত্রে তোরা যাত্রা করবি। আমি পিতার অশ্বশালা থেকে দুইটি উত্তম অশ্ব আনিয়ে রাখব। মধুকর তোদের সঙ্গে তোর মাকে নিয়ে আজ মধ্যরাত্রে যাত্রা করবেন।—ভদ্র মধুকর, আপনি সত্বর যান, চম্পার মা ও চন্দ্রকে প্রস্তুত করিয়ে ও স্বয়ং প্রস্তুত হয়ে যথাসময়ে সকলে এখানে উপস্থিত হবেন।

মধুকর বিদায় নিল। উত্তেজনার আতিশয্যে চম্পার নিদ্রা এল না। সে অবিরাম ভগবান তথাগতকে ডাকতে লাগল। পরিপূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে সে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে জেনে তার হৃদয় দুরুদুরু কম্পিত হচ্ছিল।

যথাকালে বিনীতা চম্পাকে ডেকে বলল,—চম্পা, সময় আগত। এবার প্রস্তুত হ। ভগবান তোর মঙ্গল করুন। আমার একটি কথা মনে রাখিস। যুবক-যুবতী একত্রে বেশীদিন অবিবাহিত থাকা উচিত নয়, প্রথমেই যেখানে সুযোগ পাবি সেখানেই বিবাহ সম্পন্ন করে নিবি। বলতে বলতে উদ্গত অশ্রু বিনীতার কণ্ঠরোধ করল। অশ্রুমার্জনা ক'রে সে আবার বলল,—এই কোষে কিছু স্বর্ণমুদ্রা আছে, সাবধানে রাখিস্। আর পেটিকায় কিছু খাদ্য আছে।—এই অঙ্গুরীয়—না, থাক। এ আমার দেবতার......।

চম্পা বিনীতাকে প্রণাম করে কাঁদতে লাগল। এতক্ষণ পর্যন্ত তার যে সাহস ছিল সময় উপস্থিত হ'তে তা যেন সহসা লুপ্ত হ'ল। ভয়ে তার পা কাঁপতে লাগল। দেখে বিনীতা বড় স্নেহভরে তাকে বলল,—তোর কোনও ভয় নেই বোন, তোর

Digitized by srujan ka@gmail.com

প্রেম তোকে রক্ষা করবে, যা।

চম্পা বিনীতাকে আবার প্রণাম করল, যাবার জন্য পা বাড়াল। বিনীতা দীপ হস্তে চম্পাকে উদ্যানের প্রবেশদ্বার পর্যন্ত নিয়ে গেল। সেখানে ততক্ষণে মধুকর চম্পার মা ও চন্দ্রকে নিয়ে উপস্থিত। বিনীতার সঙ্কেতমাত্র এক ভৃত্য দুইটি অশ্ব এনে দিয়ে চ'লে গেল। চন্দ্র একটিতে আরোহণ ক'রে চম্পার হাত ধ'রে অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিল। অন্যটিতে মধুকর চম্পার মা সহ আরোহণ করল। একবার সকলে বিনীতার কাছে শেষ বিদায় নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে রাত্রির নিবিড় অন্ধকারে বিলীন হ'ল। বিনীতা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরল।

* * * *

বহু বাধা বিঘ্ন ও বিপদ অতিক্রম করে মধুকর সকলকে নিয়ে কিভাবে পালুর পোতাশ্রয়ে পৌঁছাল এবং সেখান হতে পেরিপ্লাসের পোতে অন্য চারটি কলিঙ্গীয় পোত সমভিব্যাহারে কিভাবে কম্বুদ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, সেখানে সকলে কিরূপে বসবাস করতে লাগল এবং কালক্রমে তাদের অন্তে তাদের বাসস্থলী চম্পার নামানুসারে চম্পানগরী ব'লে কথিত হ'ল সে সকল কথা এ আখ্যায়িকার বিষয়ীভূত নয়।

* * * *

সবাইকে বিদায় দিয়ে বিনীতার মনে হ'ল এ পৃথিবীতে তারই জীবন কেবল শূন্য। অশ্রুসজল চক্ষে দীপ হস্তে ফিরে আসতে আসতে বিনীতার মনে হ'ল উদ্যানে এক বৃক্ষমূলের নিবিড় অন্ধকারে যেন একটি নিবিড়তর ছায়ামূর্তির আভাস।

কে, মহাশাল? বিনীতা ভীত হ'ল। সে দীপ নিবিয়ে অন্য পথে ফিরতে উদ্যত হ'ল।

বিনীতা।—ছায়ামূর্তি ডাকল।

বিনীতা কম্প্র বক্ষে থামল। এ যে তার অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর। তার হৃৎস্পনও বুঝি থেমে গেল।

ছায়ামূর্তি পুনরায় ডাকল,—বিনীতা! গভীর, ব্যাকুল তার স্বর।

সমস্ত জীবনের রুদ্ধ অভিমান হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠল। বিনীতা মুখ ফিরিয়ে আপন পথে অগ্রসর হ'ল। ছায়ামূর্তি এসে তার হস্তধারণ করল। বিনীতার সব অভিমান মুহূর্তে বিগলিত হ'ল আকুল ক্রন্দনে। ছায়ামূর্তি বলল,—প্রিয়ে, আমায় ক্ষমা কর, আমি আমার ভ্রম বুঝতে পেরেছি!

বিনীতা ছায়ামূর্তির বক্ষে প'ড়ে বলল,—প্রিয়তম!

তার বক্ষে বহুক্ষণ মুখ লুকিয়ে কেঁদে বিনীতা মুখ তুলে বলল,—প্রিয়তম, আজ

Digitized by srujan ka@gmail.com

আমার শুভ লগ্ন উপস্থিত! এই বলে সে আপন আঙ্গুল থেকে অঙ্গুরীয়টি উন্মোচন ক'রে ছায়ামূর্তির আঙ্গুলে পরিয়ে দিয়ে তাকে প্রণাম করল।

এই সময়ে অকাল ঝটিকার মত মহাশাল অশ্বপৃষ্ঠে মশাল হস্তে হঠাৎ এসে বিনীতা ও মহাকাঞ্চনকে দেখে চমকিত হ'ল। তার দুই জ্বলন্ত চক্ষুতে সে বিনীতার দিকে কিয়ৎক্ষণ মাত্র চেয়ে থেকে বলল,—বিনীতা, আমি সন্ধান পেয়েছি চন্দ্র এখানেই এসেছে। সে কোথায় আছে বল, আমি তাকে—

বিনীতা হেসে বলল,—তার আর এখন প্রয়োজন নেই, মহাশাল।

—তাহলে তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে প্রস্তুত আছ?

—কোনো প্রতিজ্ঞা আমি করিনি, মহাশাল। সে তোমার ভ্রম। আমার দেবতাকে আমি পেয়েছি। তুমি যেতে পার নচেৎ—

মহাশাল ক্রোধে গর্জন করে বিনীতার হস্ত ধারণ ক'রে তুলে অশ্বপৃষ্ঠে বসাবার চেষ্টা করল। বিনীতা নিজেকে মুক্ত করে দুইবার করতালি দিল। তৎক্ষণাৎ প্রাসাদরক্ষিগণ ছুটে এল। মহাশাল ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে নিজের তীক্ষ্ণ ছুরিকার নিমেষের মধ্যে বিনীতা ও মহাকাঞ্চন উভয়কেই হত্যা করে অট্টহাস্য ক'রে উঠল।

প্রাসাদরক্ষিগণ মহাশালকে বন্দী করল। সুভদ্র সমস্ত শুনে শোকে মুহ্যমান হলেন। বিনীতার জননী মূর্ছিতা হলেন।

পরদিন প্রভাতে বন্দী মহাশালকে নিয়ে সুভদ্রদেব মহারাজ খারবেলের নিকট যাত্রা করলেন। খারবেল সমস্ত শুনে মহাশালের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। দুই দিন পরে মহাশালের মণ্ডক ঘাতকের খড়্গাঘাতে ভূলুণ্ঠিত হ'ল।

॥ ২৩ ॥

বিনীতার বিগতপ্রাণ দেহ বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় সেইখানে কিয়ৎক্ষণ পড়ে থাকার পরে সুভদ্রদেব তা আপন প্রাসাদে নিয়ে গেলেন—অন্তিম সংকারের নিমিত্ত।

মহাকাঞ্চনের দেহ সেইখানেই পড়ে রইল। পরদিন প্রভাতে সোমদত্তের গৃহে নিয়ে যাওয়া হবে। নিবিড় অন্ধকারে বৃক্ষকুল নিস্তব্ধ, নিশ্চল। কিছুক্ষণ পরে সেই নিস্তব্ধতা, ভেদ করে কার সতর্ক, মৃদু পাদুকা-শব্দ শ্রুত হল? একটি ছায়ামূর্তি মহাকাঞ্চনের নিকটে এসে রাত্রিশেষের সেই প্রদোষান্ধকারে কিছুক্ষণ সে দেহ নিরীক্ষণ করার পরে হাতের কমণ্ডলু থেকে কিঞ্চিৎ জল নিয়ে দেহের উপর সিঞ্চন করল, তারপরে আবার অন্ধকারে বিলীন হল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় সেই ছায়ামূর্তি এসে কতকগুলি পাতার রস নিষ্কাশন করে মহাকাঞ্চনের ছুরিকাঘাতের ক্ষতস্থানে লেপন করল এবং আর কতকগুলি পত্র মহাকাঞ্চনের নাসিকাগ্রে ধ'রে বসে রইল।

Digitized by srujan ka@gmail.com

কিছুক্ষণ পরে মহাকাঞ্চন ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে লাগল। ক্রমে সে চক্ষু উন্মীলন ক'রে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। কিন্তু ভোরের ক্ষীণালোকে রক্তপাতে দুর্বল অবস্থায় কিছুই তার দৃষ্টিগোচর হ'ল না, সে কোথায় আছে, কিরূপে সেখানে এসেছে তারও ধারণা করতে পারল না। কেবল ক্ষীণ কণ্ঠে একবার বলল,—আমি কোথায়? তখন ছায়ামূর্তি তাকে ধীরে আপন স্কন্ধে উত্তোলন করে অন্ধকারে অদৃশ্য হল। পথে মহাকাঞ্চন পুনরায় জ্ঞান হারাল।

পরদিন প্রভাতে মহাকাঞ্চন সুস্থ বোধ ক'রে যখন চক্ষু মেলে চাইল, দেখল সে ঘোর অরণ্যের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে শায়িত। কষ্টে গাত্রোত্থান করে পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দেখল তার দিকে স্মিত হাস্যে চেয়ে রয়েছে—চার্বাক!

অতিমাত্র বিস্ময়ে নির্বাক কয়েকটি মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পরে মহাকাঞ্চন চার্বাকের পদপ্রান্তে পড়ে অধীরভাবে ক্রন্দন করতে লাগল।

চার্বাক তাকে তুলে পাশে বসিয়ে বলল,—বন্ধু, কোনো অবস্থাতেই অধীর হওয়া উচিত নয়, অধৈর্য বুদ্ধিনাশক। তা ছাড়া, তোমার অনুতাপ করবারও কোনও কারণ নেই। সে সময়ে তুমি তোমার কর্তব্য ব'লে যা বুঝেছিলে তাই করেছিল, বিদ্বেষবশে করনি। বর্তমানে যদি তোমার মূল্যবোধ ও বিচার অন্য প্রকার হয়ে থাকে তবে তুমি যেমন উচিত মনে করবে তাই করবে। কর্তব্যবোধ যদি অহমিকার সঙ্গে জড়িত হয়ে যায় তবে সফলতার সময়ে মানুষ গর্বিত আনন্দ অনুভব করে, বিফল হ'লে দুঃখ ও অনুশোচনায় কাতর হয়। বিনীতার জন্য তুমি পরিতাপ করো না। তোমার প্রেম ব্যাপ্ত হোক, সে সৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে বিনিযুক্ত হোক।

মহাকাঞ্চন অভিভূতের মত বলে উঠল,—গুরুদেব—

বাধা দিয়ে চার্বাক বলল,—বন্ধু, তুমি আর যে সম্বোধন কর গুরুদেব কদাপি বলো না। বরং বন্ধু বলতে পার।

—না। আমি আপনার ভাবাদর্শ দিকে দিকে প্রচার করব। সে জন্য এক মহৎ প্রতিষ্ঠান গঠন করব।

হতাশাভাবে চার্বাক বলল,—বন্ধু, এর চেয়ে বড় মূর্খতা আর কিছু নেই। বরং লোকসমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি অথবা স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিষ্ঠান গড়া যেতে পারে। এমনি ব্যাপারে রাজ অনুশাসনের দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানকে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করাও হয়তো অনুচিত হবে না। কিন্তু যে বিষয় নির্ভর করে মানুষের মুক্ত চিন্তার উপর সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিণামে লভ্য হবে কেবল এক প্রকার বদ্ধ জলাশয়। চিন্তার মুক্ত স্রোত তাতে থাকবে না, অল্প দিনেই তা হয়ে উঠবে দূষিত, তাতে অবগাহন করে মানুষের চিত্ত দূষিত, বিকল হবে। আর, আবার বলি

Digitized by srujan ka@gmail.com

আমি তোমার বন্ধু, গুরুদেব নই।

—উত্তম। চার্বাক, আমার প্রিয়সখা মধুকর এখন সুদূরস্থ। আমার এই সদ্য বন্ধুবিচ্ছেদে তুমি তার স্থান নিলে। অধিকন্তু, যে তোমার প্রাণ নিতে চেয়েছিল তাকে প্রাণ দিলে। বন্ধু, আমি মধুকরকে তোমার কথা বলেছিলাম, সেও তোমার মতই তার স্বকীয় চিন্তায় আস্থাবান্। তবে বন্ধু, প্রথমে বল তুমি জীবিত হয়ে উঠলে কি করে? কোন অলৌকিক ঘটনা পরম্পারার ফলে? না কি তোমার উপরে পলাল পীঠক দণ্ডের আদেশ আদৌ পালিত হয় নি?

—না, হয় নি। তোমার দণ্ডাদেশ লঙ্ঘন ক'রে ঘাতকেরা আমাকে কেবল প্রহারে হতচেতন করে অন্য রাজ্যের সীমানার মধ্যে অরণ্যে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু সে কথা থাক। তোমার পিতামাতা হয়তো ইতিমধ্যে তোমার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে শোকে অভিভূত হয়েছেন, তোমার প্রথম কর্তব্য তাঁদের পাদবন্দনা। কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি অতিশয় দুর্বল।

—যথার্থ। কিন্তু আমি দুই দিন পরেই আমার কর্তব্য পালন করতে পারব। তা না করা পর্যন্ত আমি শান্ত চিত্তে কোনো আলোচনা করতে পারব না।

—অবশ্যই, বন্ধু। আপাততঃ কেবল ভবিষ্যৎ কার্যপন্থা নিয়ে লঘু ও মৃদুভাবে যৎকিঞ্চিৎ চিন্তা করা যেতে পারে। প্রথমে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন বেছে নেওয়া যাক্, যথা—প্রথম প্রশ্ন ঃ এই বিশ্বচরাচর কি কোনও শক্তি বা কোনও নিয়মের দ্বারা সৃষ্ট? না সেটা ধ'রেই নেওয়া যেতে পারে?

—কেন, নিয়মের দ্বারাই সৃষ্ট ব'লে ধ'রে নেব কি ক'রে?

এই উত্তরে চার্বাক প্রীত হয়ে মহাকাঞ্চনের দিকে চাইল। বলল,—সাধু! ধন্য বন্ধু! আমি এই প্রথম তোমার মুখে এই মৌলিক 'কেন' শুনলাম। তোমার পূর্বসংস্কার দূর হয়েছে, এবার স্বচ্ছন্দে এগনো যাবে। —আচ্ছা, তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি বলব : পুরুষ ও স্ত্রী দুই বিভিন্ন দিকে বিকাশ লাভ করলেও তাদের সৃষ্টির বা জন্মলাভের নিয়ম একই এ কথা তুমি স্বীকার করবে?

—হাঁ!

—বেশ। মানুষ ও পশুর সৃষ্টির মধ্যেও একই নিয়ম এ কথা স্বীকার করবে?

—করব।

—এইরূপ জীব ও জড়ের মধ্যেও একটি নিয়ম নিশ্চয় আছে? যার দ্বারা গ্রহ উপগ্রহ সূর্য চন্দ্র তারা থেকে আরম্ভ করে অণু পরমাণু পর্যন্ত সৃষ্ট ও একই বিরাট পর্যায়ভুক্ত?

—ততঃ কিম্?

Digitized by srujan ka@gmail.com

—এখন দেখা যাক্ এই নিয়মের দ্বারা বা শক্তির দ্বারা ক্রমে মানুষের সৃষ্টি হওয়ার পরে মানুষ তার নিজের ইচ্ছা ব'লে বাস্তবিক কোনও স্বতন্ত্র বস্তু পেয়েছে, না তার প্রত্যেকটি কর্ম, প্রত্যেকটি চিন্তা—সে যতই সামান্য হোক—সবই সেই আদি শক্তি দ্বারা চালিত? যদি দ্বিতীয়টি সত্য হয় তবে মানুষের বিকাশের নিমিত্ত মানুষের নিজের আর কোনও দায়িত্ব থাকতে পারে না, কারণ—আমরা যেমন ধ'রে নিয়েছি—সেই অদৃশ্য শক্তিই মানুষকে কোনও অজ্ঞাত উদ্দেশ্য সাধনের পথে চালিত করছে। আমি এই মুহূর্তে এই যে কথাগুলি বলছি এরও তবে নিজস্ব কোনও মূল্য নেই, আমার কথাগুলি কেবল সেই শক্তির অবশ্যম্ভাবী এক ফল মাত্র। এমতাবস্থায় সেই উদ্দেশ্যটি—যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকে—কি সে উদ্দেশ্য তাও আমরা কোনও দিন কোনও মতেই জানতে পারব না—যদি সে শক্তির নিজেকে জানাবার উদ্দেশ্যে না থাকে। এক কথায়, দ্বিতীয়টি সত্য হলে আমাদের দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই—পৃথিবীতে যত দুঃখ যত যুদ্ধ হিংসা যত রক্তপাত থাক না কেন আমরা সে সবের জন্য তিলমাত্র দায়ী নই।

কিন্তু যদি প্রথমটি সত্য হয়—চার্বাক ব'লে চলল—অর্থাৎ যদি আপন ইচ্ছা ব'লে কিছু থাকে, তাহ'লে নিজের বিকাশের সম্পূর্ণ বা অন্ততঃ অধিকাংশ দায়িত্ব নিজের উপরেই বর্তায়। এবং এমতবস্থায় আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ স্থূলতঃ কি প্রকার হওয়া উচিত তা আমাদেরই স্থির করতে হবে এবং সর্ব প্রথমেই স্থির করতে হবে। তার পর সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার সর্বোত্তম কার্যপন্থা কি তা স্থির করতে হবে—আমাদের মৌলিক স্বভাব আমাদের পরিবেশ প্রভৃতি বিবেচনা ক'রে। সেই জন্য যদি শাসনের প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় তবে সে শাসন কি প্রকারের হবে তাও স্থির করা আবশ্যক। আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিক্ষা পরিকল্পনা, কৃষি পরিকল্পনা, দণ্ডনীতি প্রভৃতি সব যেন সেই লক্ষ্যের অভিমুখী হয় তাও দেখতে হবে, নয়তো আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে ঐক্যের পরিবর্তে পরস্পর-বিরোধিতার সৃষ্টি হয়ে সমস্ত পণ্ড হ'তে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি আমাদের জীবনের লক্ষ্য হয় তবে আমাদের অর্থনীতি এমন হওয়া উচিত যাতে বৈষয়িক ব্যবস্থা তার বাধাস্বরূপ হয়ে না দাঁড়ায়। হয়তো সেজন্য এমনই নিয়ম তৈরি করতে হবে যাতে কারও নিজস্ব ধনসম্পত্তি ব'লে কিছু থাকবে না। আমার মনে হয় মানুষ যেন ক্রমে সে দিকেই চলেছে। সেই যাই হোক, মনুষ্য সমাজকে শাসন করতে গেলে তার পূর্বে এই প্রকার কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক। আবার, এইখানেই ব'লে রাখি যে 'আধ্যাত্মিক' শব্দটি উচ্চারণ মাত্রে বিগলিত হবার দরকার নেই। শব্দের মোহ বড় ভয়ানক মোহ। একটা উদাহরণ

Digitized by srujan ka@gmail.com

হিসাবেই কেবল আধ্যাত্মিকতার কথা বললাম।

মহাকাঞ্চন কিয়ৎক্ষণ নীরব থেকে প্রশ্ন করল,—বন্ধু, আর একটি প্রশ্ন আমার মনে আসছে : মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ সমাজ বা গোষ্ঠীর, দেশ বা জাতির মাধ্যমে হওয়া উচিত, না এই সকলের বিলোপ ক'রে কেবল ব্যক্তির মাধ্যমে হওয়া উচিত?

চার্বাক আবার কিছুক্ষণ হৃষ্টচিত্তে মহাকাঞ্চনের দিকে চেয়ে থেকে তারপর বলল,— বন্ধু, অতি জটিল তথা অতি মৌলিক তোমার প্রশ্ন। সমষ্টি না ব্যষ্টি! হয়তো এই প্রশ্নের সমাধানের উপরেই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের সুখ ও শান্তি। এ খুব তলিয়ে চিন্তা করবার বিষয়। তবে মনে হয় সমাজ যদি ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ কবলিত করে তার ফলে যে ভ্রষ্টাচার দেখা দেবে, ব্যক্তি যদি সমাজকে কবলিত করে তাতেও সেই ভ্রষ্টাচার দেখা দেবে।

কথা বলতে বলতে দুই বন্ধু ক্রমে ঘন অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। পূর্ব দিগন্তে তখন উদয়াকাশের স্বর্ণাভ রেখা।

Digitized by srujan ka@gmail.com